সাদা দু'টি ফুল বেলি ও বকুল

আবদুল হামীদ ফাইযী
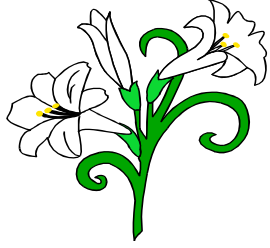
আব্দুল হামীদ

ভূমিকা

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পুস্তিকার অবতারণা, সেটি হল বাংলা ১৩৮৮ সালের। লেখার প্রস্তুতি পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু পেশা ও নেশার সাথে সমঞ্জস নয় বলে চেপে রেখেছিলাম। এতদিন পর কিছু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে লিখে ফেললাম।

উদ্দেশ্য সতর্কীকরণ, তা কিছু অংশেও ফলপ্রসূ হলে উদ্দেশ্য সফল হবে। অবাধ যৌন-স্বাধীনতার বন্যায় ভাসমান কিস্তিতে বসবাস ক'রে এই শ্রেণীর সতর্ক-বাণী কতটা কাজে লাগবে, তা জানি না। তবুও আমার আশা, দ্বীনদার যুবকদের বড় কাজে লাগবে। যারা পিচ্ছিল পথে যাতায়াত করে, তাদের পা শক্ত হবে।

মহান আল্লাহ মুসলিম যুবক-যুবতীকে সুপথ দেখান আমীন।

আব্দুল হামীদ
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৫/ ১১/২০১০

(১)

সন্ধ্যাবেলায় চায়ের আসরে গল্প জুড়েছিল বকুলের পরিবার। বোন বিলকিসের চোখে-মুখে ছিল আশাবাদিতার উজ্জ্বল আলো। আম্মার বুকে ছিল আকাশ-জুড়ে আশার সূর্য। আব্বার দুর্বল দেহের ভিতরে হৃদয়ের আশা সবল ছিল। সবারই ধারণা ছিল, আজ নিশ্চয় বকুল চাকরির খবর নিয়ে ঘরে ফিরবে।

ছ'টার লোকাল পার হয়ে গেল। বকুল কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে এল। সেই সকালে বেরিয়ে ছিল ছ'টার লোকালেই। ঠিকমত খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। ব্যস্তময় শহরের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে তার জিভ যেন শুকিয়ে গেছে। পানির পিপাসা তার ওষ্ঠাধরে। চাকরির কথা পাকা হলে হয়তো তার এই পিপাসা অনুভূত হতো না। তার চেহারা বলছে, তার চাকরির নিশ্চয়তা সে পায়নি। সুসংবাদ নিয়ে যে আনন্দের সাথে বাড়ি ঢোকা যায়, সে আনন্দের চিহ্ন তার মুখমণ্ডলে নেই। তাই সবাই তার নিরাশ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিলকিস উঠে গিয়ে হতাশভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাইজান! চাকরিটা হয়নি বুঝি?'

বকুল কাগজের ফাইলটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে নিরাশ কণ্ঠে উত্তর দিল, 'না-রে বোন! সবই কপাল। জানিস, চাকরি হল সোনার হরিণ, শোনা যায়, দেখা যায়---ধরা সুকঠিন।'

বি-এ পাশ ক'রে বকুল চাকরির জন্য বহু ইন্টারভিউ দিয়েছে, তাতেও পাশ করেছে। কিন্তু চাকরির নিশ্চয়তা সে পায়নি।

কোথাও ঘুস চেয়েছে। কিন্তু ঘুস দেওয়ার মত টাকা আছে কোথায়?

বিঘে-কয়েক জমি নিয়ে এ বাড়ির ক'জনের জীবন চলে। আব্বা বড় কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছে একটা চাকরি হবে বলে। সেও আর ঠিকমত জমিগুলির চাষ করতে পারে না। সেও লেখাপড়া শিখে আজ না থেকেছে মুনিষ, আর না হতে পেরেছে মানুষ।

মাথার ওপর বোন উঠেছে। তার বিবাহ দিতে হবে। এক বন্ধুর সাথে যদিও কথা হয়ে আছে। কিন্তু যৌতুকের টাকা যোগাড় করতে হয়তো জমি বিক্রি করতে হবে।

টানাটানির সংসার। অসুখ-বিসুখ তো আছেই। এ সবের মাঝে ঘুস দিয়ে চাকরি নেওয়া তো আকাশ কুসুম কল্পনার মত।

এক জায়গায় চাকরি হতে গিয়ে আর হয়নি। সবকিছুতে পাশ ক'রে চেহারায় ফেল। দাড়ি-ওয়ালাকে চাকরি দেওয়া হল না। দুর্বল ঈমানের বকুল তারপরে দাড়ি কেটে ফেলেছিল।

তারপরেও এক জায়গায় চাকরি হওয়ার মুখে জবাব এল। মুসলিম বলে তাকে সে চাকরি দেওয়া হল না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বকুল ইসলামের খাতা থেকে তার নামটি কেটে ফেলতে পারেনি।

চাকরির জন্য কত জায়গা গেছে, কত সোর্স ধরেছে, কোন ফল হয়নি। জীবন-যুদ্ধে কোন একটা কাজ ধরবে ভেবেছে, তাও পারেনি।

কোন কোন বন্ধু তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছে,

'কোন কাজ ছোট নহে, নহে সে নগণ্য,
যদি পার কিছু কর জীবনের জন্য।'

কিন্তু কোন কাজে বকুলের মন ওঠেনি।

এক শ্রাবণে টানা বৃষ্টি-বাদল চলছিল। ঘরে ভাতের চাল নেই। আম্মা দুশ্চিন্তায় ছিল সকাল বেলায়। কাউকে যেন সে বলতে পারছিল

না। আব্বা চাষী। তবে পরের মুনিস খাটে না। আর বকুল কোনদিন মাঠে যায়নি। পড়াশোনার নামেই সে চাষের কাজে নাক সিঁটকে এসেছে। পরের চাকরি করতে চাইলেও চাষের কোন কাজ করতে সে মোটেই রাজী নয়।

গত কয়েকদিন থেকে ঝিমঝিম বৃষ্টি চলছে। মাঠে পুরোদমে চাষ চলছে। অল্প জমি বলে বকুলদের চাষ হয়ে গেছে। পাড়ার শফিকদের অনেক জমি। তাদের চাষ শেষ হয়নি। হঠাৎ শফিকের মা কুলো মাথায় বাড়িতে প্রবেশ করল।

বকুলের মা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার ফুফু আম্মা! এই বাদলের সাত সকালে কী মনে ক'রে?'

---আর বলো না মা। মাঠে ভরপুর চাষ। আজকে আবার লাঙ্গুলে মুনিষটা আসেনি। তার অসুখ নাকি বলছে। তাই আমি বলছিলাম, বকুলের বাপ যদি লেগে দিত, তাহলে হাল কামাই হতো না। আমি মুনিষের দাম দিয়ে দেব।

কথাটা বলেও যেন শফিকের মা লজ্জায় পড়ল। লজ্জায় পড়ল বাড়ির সকলে। সবচেয়ে বড় লজ্জা ও দুঃখ পেল বকুল। সে নির্দ্বিধায় বলে উঠল, 'না-না, আব্বা যাবে না। তোমরা অন্য কাউকে দেখো গে।'

কিন্তু তার মা আর সংসারের খবর গোপন রাখতে পারল না। চালের ডেয়ে ফাঁকা। অতএব পেটে খিদে, মুখে লাজ কেন? সে বলে উঠল, 'না-না, যাবে।'

বকুল আবার জোর দিয়ে বলল, 'না, যাবে না।'

আম্মা বলল, 'তাহলে তুই যা।'

---আমি যাব? কেন?

---বাড়িতে যে ভাতের চাল বাড়ন্ত, তা কি তুই জানিস?

বকুলের আব্বা কাল বিলম্ব না ক'রে গামছাটা হাতে নিয়ে পেঁকে মাথায় শফিকের মাকে 'চলো ফুফু' বলে বেরিয়ে পড়ল।

লজ্জায় বকুল যেন কাল হয়ে গেল। দুঃখের অশ্রুতে তার চোখ দু'টি ঝলমল করতে লাগল। স্নেহময়ী বোন বিলকিসও কাঁদছিল। কাঁদছিল সকলের অভাব দেখে, উপায়হীনতা দেখে। এই ছিল প্রথম দিন, যেদিন তাদের আব্বাকে পরের ক্ষেতে খেটে ভাতের চাল যোগাড় করতে হয়েছে।

বকুল নামাযী ছেলে। তবে গ্রাম যেহেতু তওহীদবাদী নয়, সেহেতু সেও অন্ধভক্ত বিদআতী। মসজিদের ইমাম সাহেব যুবক। তার সাথে কত কথা হয়। সুখের কথা, দুঃখের কথা। ইমাম সাহেবেরও অভাবের সংসার। মসজিদের চাকরিতেই বা বেতন কত? একে অন্যকে দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে মনে সান্ত্বনা নেয়। ইমাম সাহেব আবার বড় পীরভক্ত। কলকাতার এক পীর সাহেবের অন্ধ মুরীদ তিনি। সকল কাজে পীর সাহেবের পরামর্শ নেন। সুখের সময় এবং দুঃখের সময়ও। অসুখে ডাক্তার-খানা যান না, পীরবাড়ি যান। সেখানে আরোগ্য পান। বাড়ি করলে বাড়িটা কোন্ দুয়ারী করবেন, তাও পীর সাহেবকে এক কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নেন। ছেলে-মেয়ের নাম রাখেন পীর সাহেবের উল্লেখ অনুযায়ী। বাড়িতে কোন জিনিস হারিয়ে গেলে, তার খোঁজ নেন পীর সাহেবের কাছে! তিনি মনে করেন, পীর সাহেব ভূত-ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর জানেন। পীর সাহেব বিপদে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর দাবী, তাঁর পীর নাকি 'কামেল পীর'।

একদিন গল্প করতে করতে তিনি বকুলকে বলেই ফেললেন, 'আপনি একদিন হুজুর-কেবলার কাছে যান। আপনার অবস্থা খুলে

বলুন। নিশ্চয় তিনি একটা যথাবিহিত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কলকাতার বহু অফিস-আদালত সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা আছে। কোন একটা চাকরিও তিনি ক'রে দিতে পারবেন। তাঁর উপর ভরসা রাখলে, তিনি ভক্তকে রিক্ত রাখেন না।'

বকুল শিক্ষিত ছেলে। তার এ সবে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু চাকরি একটা পেতেই হবে---এই দৃঢ় সংকল্প তাকে বহু অবিশ্বাস্যও বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে।

একদিন সে ইমাম সাহেবের কথা মতো কলকাতার পীরবাড়ি পৌঁছে গেল। ইমাম সাহেবের পরিচয়ে পীর সাহেব বকুলকে আশ্বাস দিলেন এবং তাকে তাঁর আশ্রমেই থাকতে অনুমতি দিলেন।

ইমাম সাহেব ফিরে গেলেন।

পীর সাহেবরা দুই ভাই। পিতাও পীর ছিলেন। তাঁর পর্দা নেওয়ার পর দুই ভাই-ই খেলাফত পেয়েছেন। এক সময় বড় হুজুর বকুলকে ডেকে বললেন, 'বকুল! তোমার চাকরির ব্যবস্থা আমরা করছি। এখন যতদিন না তোমার চাকরি হচ্ছে, ততদিন আমাদের বাড়ির কাজে সহযোগিতা কর। তোমার কিছু বেতনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বকুলের মনে প্রস্তাবটা বড় খারাপ ঠেকল। একজন গ্রাজুয়েট ছেলে প্রেস্টিজ রাখতে গিয়ে বাপ চাষী হওয়া সত্ত্বেও চাষের কাজ করেনি। এখন সে অন্যের বাড়িতে 'খাদিম'-এর কাজ করে কীভাবে? সে বড় হুজুরকে কোন কথা না দিয়ে বলল, 'জী। ভেবে দেখব।'

রাত্রে তার রুম-পার্টনারের কাছে প্রসঙ্গটা তুলল। রুম-পার্টনারও পীর সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও খাদিম। সে বলল, 'দেখ বকুল। এটাকে খারাপ মনে করছ কেন? চাকরি তো সবাই করে। কেউ সরকারের

চাকর, কেউ কোম্পানির চাকর, কেউ দোকান-মালিকের চাকর, আবার কেউ কোন বাড়ির চাকর। যে চাকর, সেই তো চাকরি করে। তাছাড়া তুমি তো ছোটখাটো যার-তার চাকর হতে যাচ্ছ না। তুমি হবে বড় হুজুরের চাকর। আরে খানকার খাদিম হওয়া কি কম গর্বের বিষয়? আরো একটা কথা আছে, তুমি যে এখানে হুজুরের বাড়িতে খাদিম-গিরি করছ, তা তো তোমার দেশের বাড়ির কেউ জানতে পারছে না। তুমি টাকা পাঠাবে, বাড়ির লোক খোশ হয়ে যাবে। তোমাকে হয়তো জিজ্ঞাসাই করবে না যে, তুমি কী চাকরি কর। আর করলেও বলো, কলকাতায় এক অফিসে চাকরি করি। আরে এটাও তো এক প্রকার অফিস। তাই নয় কি?'

বকুল সঙ্গীর কথাগুলি হাঁ ক'রে শুনছিল। উপায় না দেখে সে তাতেই রাজী হয়ে গেল। পর দিনের সকাল থেকে তার চাকরির জীবন শুরু হল 'হুজুরের খাদিম' রূপে।

(২)

সাদা বেলি ফুলের মতই কাটছিল বেলির জীবন। অবশ্য তার চেয়ে ছোট বোন চামেলি বেশি সুন্দরী। অভাবের সংসার তাদেরও। আব্বা দিন-মজুর। আম্মাও পরের বাড়িতে কাজ ক'রে সংসার চালায়। দাদার জমি-জায়গা আছে, কিন্তু সে বর্তমান। আম্মার চরিত্র-দোষে দাদা তাদেরকে পৃথক ক'রে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সংসার দুঃখের বললেই চলে। তবে বেলি-চামেলির মন কিন্তু গরীব নয়। তাদের হাব-ভাবও বড়লোকী। পেটে ভাত না থাকলেও ঠোঁটে ঠোঁটপালিশ অবশ্যই থাকে।

চপল চামেলির এই ভাব-ভঙ্গি দেখে বোলপুর শহরের এক প্রসিদ্ধ

বিদেশী বস্ত্র-ব্যবসায়ী চল্লিশোর্ধ্ব প্রৌঢ় তার প্রেমে পড়ল। চামেলিরা প্রায় তার দোকান থেকেই কাপড়-চোপড় কেনাকাটা করত, নেহাত সস্তা দিত বলেই। কিন্তু তার পশ্চাতে ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য তাদের অজানা ছিল। এক বছর ঈদের সময় বহুমূল্যের একটি লাল বেনারসী শাড়ি উপহার দিল চামেলিকে। চামেলি চমকে উঠে বলল, 'এ তো বিয়ের শাড়ি! এর দাম দেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের নেই।'

ব্যবসায়ী বলল, 'তোমাদের না থাকলেও তোমার আছে।'

অতঃপর সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলল সে। চামেলি মা-বাবার কাছে জানালে তারা এ সুযোগ হাতছাড়া করল না। যদিও চামেলি রাযী ছিল না। কারণ, লোকটির এত বয়স। স্বদেশে তার পরিবার-সন্তান আছে। সুতরাং এ পছন্দ নির্ঘাত অন্যায় ছাড়া আর কী? তবুও যেহেতু বিবাহে কোন যৌতুক লাগবে না। তার উপর সংসারের টানও হয়তো ব্যবসায়ী জামাই টানবে। তাই মেয়েকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাযী করল তারা। দুই কন্যাদায়ের ভার অর্ধেকটা লাঘব হল।

হয়েও গেল বিবাহ। চামেলির দেহ-মনে বসন্ত এল।

বেলি বড় হয়েও অনূঢ়া থাকল। বড় আইবুড়ো থাকতে ছোটর বিয়ে হলে, বড়র বিয়ে হতে কষ্ট হয়। পাত্রপক্ষের সন্দেহ হয়। সুতরাং পণ ছাড়া বেলির বিয়ের কোন কথাই নেই।

দুশ্চিন্তায় মা-বাবার ঘুম আসে না। যদিও জামাই বলেছে, 'বর দেখুন, বিয়ের খরচ আমি দেব।' তবুও মোটা টাকার পণের কথা তো আর তাকে বলা যাবে না।

বেলির মা অনুরূপ আরো একটি সুযোগ খুঁজছিল। আর সেই জন্যই যুবকদের সাথে খোলামেলা মিশতে সুযোগ দিতে লাগল। কোন যুবক

মেহমান এলে খাওয়া-খিদমতের ব্যবস্থায় তাকেই নিযুক্ত রাখল। ছোটবেলায় কুরআন পড়তে শেখেনি বেলি। তা শেখার জন্য যুবক মৌলবী সাহেব নিয়োগ করল। হাটে-বাজারে তাকেই পাঠাতে লাগল। ইচ্ছামত ছেলে অথবা মেয়ে বন্ধু বেছে নেওয়ার পুরো এখতিয়ার দিল। উদ্দেশ্য একটাই, 'কারো সাথে ঘটে তো ঘটে যাক, পটে তো পটে যাক, আর বিনা পণে বিয়েটা লাগে তো লেগে যাক।'

হ্যাঁ, বহু মানুষই এমন আছে, যাদের অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। অনেকে ঠেলায় পড়েই ঢেলায় সালাম করে। দারিদ্র্যের ফলে নৈতিকতা ভুলে যায়। অনটনের বিড়ম্বনায় আদর্শচ্যুত হয়। ক্ষুধার জ্বালায় ধর্ম পরিবর্তন করে। অভাবের তাড়নায় চরিত্র নষ্ট করে। পেটের উনুন ভরতে ঈমানের গাছ কাটে।

গ্রামের এক বিধবা আছে। সেও এক অভাগিনী। বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই স্বামী তাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে গেছে। বহুমুখী ব্যথা তারও।

অনেক অভাগা জীবনের ব্যথা ভুলতে মাদকদ্রব্য সেবন করে। শিক্ষা পায় কোন মাতালের কাছ থেকেই। কিন্তু ঐ অভাগিনী ব্যথা ভুলার ওষুধ হিসাবে খোঁজ পেয়েছিল অন্য এক বস্তুর। আর তা হল ব্যস্ততা। তার বক্তব্য হল, কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা ও পাপ থেকে বাঁচতে কোন বৈধ কাজে ব্যস্ত হতে শিখ। যিকির কর, কুরআন পড়, বুযুর্গদের খিদমত কর। সে এই আধ্যাত্মিক পথ্য লাভ করেছিল এক দরবেশের নিকট থেকে। সেই তাকে দেখিয়েছিল কলকাতার পীরবাড়ি। যেখানে গিয়ে পীরবাড়ির মহিলাদের সাথে মিশে অনেক দুঃখ-ব্যথা ভুলা যায়। হুজুরদের খিদমত ক’রে নাকি অনেক সওয়াব হাসিল করা যায়।

অবশ্য কলকাতায় দূর সম্পর্কের তার এক ভাইও থাকে। সে সেখানে ব্যবসা করে। সে কলকাতা গেলে প্রথমে ভাইয়ের বাড়িতে ওঠে। ভাবী রেক্সোনার কাছে দু-একদিন কাটিয়ে তারপর পীরবাড়িতে যায় মনের শান্তি নিতে। কি জানি, সেখানে শান্তির খোঁজে সে কোন কষ্ট পায় কি না?

শুধু নিজেরই নয়, অনেক মানুষের ব্যথা-বেদনা সে নিজের পদ্ধতিতে মোচন করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ মানুষ কাতে পড়লে পীরের নাম নেয়। আর সেই সুযোগ ব্যবহার করে নফুরা। এমনকি কারো গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে তাকেও নিয়ে যায় সেই পীরের কাছে!

বাড়িতে বিধবা একাকিনী থাকে। বেলিই মাঝে মাঝে তার বাড়িতে গিয়ে বাস করে, রাত কাটায়, মনের কথা খুলে বলে। এক সন্ধ্যায় বেলি তাকে তার অনেকগুলি দুশ্চিন্তার কথা বলছিল। তার সাথে এ কথাও বলে ফেলল যে, মা তাকে খারাপ করতে চায়। কোন রকম বাড়ি থেকে বিদায় করতে চায়। এদিকে বয়সও তো থেমে থাকে না।

বিধবা নফুরাও অনেক মনের কথা তাকে বলে। সম্পর্কে চাচী হলেও সে তার এক প্রকার বন্ধুর মত। নফুরা বলল, 'মৌলবী সাহেব তোকে ভালবাসেন না?'

বেলি সলজ্জ হেসে বলল, 'কেন বাসবেন? ভাল ভাষা বললেই কি আর ভালবাসা হয়? তিনি কি এই গরীব হতভাগীকে গ্রহণ করবেন?'

---কথায় বুঝতে পারিস না?

---কৈ না।

---আমি মাঝে মাঝে কলকাতায় থেকে আসি। তুই সেখানে যাবি? থাকতে পারবি?

---ভাল জায়গা হলে কেন পারব না?

---যাস্ তো হুজুরদেরকে বলব, তোর একটা বরও ঠিক ক'রে দেবে।

---ঠিক আছে। আমাকে আর এই দোযখে থাকতে ভাল লাগে না।

প্রাইভেট যারা পড়ায়, তাদের অধিকাংশ ভাল ছাত্রীর প্রেমে পড়ে, তাকে বিয়েও করে। বেলির প্রাইভেট কুরআন মাষ্টারও কি সেইরূপ? বেলি সেটাই পরীক্ষা করার জন্য আজকে প্রসঙ্গ তুলে বলল, 'আমি কলকাতা চলে যাব। সেখানে হুজুরদের খিদমত করব......।'

---কলকাতা? হুজুরদের খিদমত? কিন্তু তুমি তো যুবতী মেয়ে।

---তা হলাম তো কী? চাচী বলছে, উনারা বাপের মতো। প্রত্যেক মহিলা মুরীদ তাঁদের বেটির মতো।

---'মতো' বললেই তো সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায় না। আসলে তো নয়। আর শহরে তুমি খারাপ হয়ে যাবে।

---গ্রামেই বা কী ভাল আছি বলুন? তেঁতুলঘোলা কপালে কি আর সুখ আছে? ভাসমান তরীর মত ভেসে আছি। অজানা-অচেনা পথের অপেক্ষায় দিন পার হয়ে যাচ্ছে।

---আল্লাহর কাছে চাও। মাঝ সমুদ্রে তোমার এই ভাসমান তরীকে কোন ভাল কুলে ভিড়িয়ে দেবেন। আচ্ছা, তোমাদের জামাই কোন পাত্র যোগাড় করতে পারছে না?

---পাত্রের কি অভাব আছে বলুন? মন চাই, পণ চাই।

সেদিনকার আলোচনায় বেলি বুঝল, তার মৌলবী সাহেবের মন পটেনি। সুতরাং সে তার পীরভক্ত চাচীকে সে কথা জানিয়ে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

বেলি হাতের কাজ জানে। শান্তিনিকেতনের শাড়িতে ফুল করে,

খেজুর পাতার চাটাই বোনে। সেই উপার্জন থেকে টিকিটের পয়সা যোগাড় হলে একদিন ঐ চাচীর সাথে কলকাতায় গিয়ে পীরবাড়িতে উপস্থিত হল।

হুজুর সাহেবদের পত্নীগণ বেলির রূপ, পরিচ্ছন্নতা, হাসি-খুশী মেজাজ ও মিষ্টি মিষ্টি কথা দেখে খুব সন্তুষ্ট ও প্রীত হলেন। সে এখানে তাঁদের খিদমতে থাকবে জেনে বড় খুশী হলেন।

সন্ধ্যায় বেলির হাতে বানানো চা পান করল সকলে। অতঃপর পুরনো খাদিমা পীরবাড়ির সকল কাজ তাকে বুঝিয়ে দিল, এই দরজার ঐ পাশটা পুরুষদের। ঐ পাশে যাওয়া নিষেধ। এই জায়গায় আমরা আসতে পারি না। এখানে কেবল হুজুর ও তাঁর স্ত্রী আসেন। এটা হুজুরের মুরাক্বাবা (ধ্যান) রুম। এটা বেড রুম, এটা খাবার রুম, এটা কিচেন। এটা মহিলাদের খাস বাথরুম। এটা বড় হুজুরের আম দরবার। এটা ছোট হুজুরের আম দরবার। এখানে উঁচু শব্দে কথা বলা নিষেধ। ওখানে উঁকি দেওয়া নিষেধ। হুজুরদের সামনে ঘোমটা টেনে থাকতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাবতীয় কর্ম ও কর্তব্য বুঝে নেওয়ার পর ভারি মনে হলেও সাথের সাথী রয়েছে জেনে সহজভাবে বরণ ক'রে নিল। হয়তো সে মনে মনে গর্বিতা ছিল এই বলে যে, আজ থেকে সে দু-দুটো হুজুরের খাস খাদিমা। এখানে পীরের খিদমত ক'রে তার বিড়ম্বিত জীবনের যদি কোন হিল্লে হয়।

(৩)

যতই পর্দা বাড়ি হোক, বাড়ির চাকর-চাকরানীর কোন ফাঁকে একত্রিত হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ ক'রে ঈদ, উরস,

মীলাদ বা কোন বিবাহের সময় পর্দার বাঁধন অনেকটা শিথিল হয়ে যায়; বিশেষ ক'রে সেই মহিলাদের মনে, যারা পর্দাকে নিছক 'অবরোধ প্রথা' বলে মনে করে। তাছাড়া খাদিমারা পর্দা করতে আদিষ্ট নয়। তারা বাজারে যায় বেপর্দা হয়েই। পর্দা বিবিদের জন্য মার্কেট ক'রে আনে বেপর্দা খাদিমারা। আর বাইরে গিয়ে কে কোথায় কার সাথে কথা বলছে, তার খবর কে রাখে?

পুরুষ মহলে বকুলের নাম ছিল। শিক্ষিত, বিনয়ী ও ভদ্র ছেলে। ফুলের সৌরভ গাছের পরিমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যতটা পারে, ছড়িয়ে যায়। বকুলের সৌরভও মহিলা মহলকে সুরভিত ক'রে ফেলেছিল। আর সেখান থেকেই বেলির আকাঙ্ক্ষিত মনে তার প্রেম বাসা বেঁধে নিল।

'মানুষ মানুষের কাছে, অচেনা ভাবে আসে,
চরিত্রের গুণে মানুষ সবার চোখে বাসে।'

তাকে এক নজর দেখার সাধ মনে জাগল। আর চেষ্টা থাকলেই উপায় হয়। একদিন বড় হুজুরকে চা দিতে গিয়ে সে সাধ মিটে গেল।

তাকে প্রেমের পয়গাম দেওয়ার ইচ্ছা জাগল। এখানে তো হাতে গোলাপ ফুল ধরিয়ে দেওয়া যায় না। তাই গোলাপের পাপড়ির মত রাঙা ঠোঁটের মিষ্টি হাসি দূর থেকে উপহার দিয়ে তার প্রেম-ভুবনে বকুলকে 'স্বাগতম' জানাল।

বকুলও সাদা বেলির সৌরভ পেয়ে গৌরবের সাথে তার কেলি আরম্ভ করল। পীরবাড়ি হল তো কি? যুবক-যুবতী তো।

উভয়ের মনে নির্জনে সাক্ষাৎ-বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। সে বাসনাও পূরণ হল একদিন পানের দোকানে। ফিরার গলি পথে যেতে যেতে

বকুল লজ্জা ভেঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই কি বেলি?'

এক নজর তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ক'রে বেলি বলল, 'জী।'

---কেমন আছ তুমি।

---ভালই আছি। আপনিই তো বকুল? তাই না?

---বাঃ! আমাকে দেখে ফেলেছ বুঝি।

---আপনি বড় হ্যান্‌সাম।

---তুমিও বড় স্মার্ট।

---পর্দার আড়াল থেকে আপনার আওয়াজ খুব শুনতে পাই।

---আমিও তোমার আওয়াজ শোনার জন্য কান পেতে থাকি।

---কেন?

---জানি না কেন। তুমি কি ডেলি এই সময় পান নিতে আসো বেলি?

---ডেলি নয়, তবে বেগম সাহেবা পাঠান মাঝে মাঝে।

হঠাৎ পথ শেষ, কথাও শেষ। বকুলের দিকে আরও একবার দৃষ্টি ফিরালো বেলি, তারপর অন্দর মহলে চলে গেল।

তার পরনে ছিল সবুজ শেলোয়ার-কামিস, মাথায় কপাল ঘেসে ওড়না। সুস্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী। গেঁয়ো মেয়ে হলেও শহুরে স্টাইলে কথা। চলার ভঙ্গিমা লাস্যময়ী। চোখের দৃষ্টি আকর্ষণীয়। সৃষ্টিনাশ করা মিষ্টি হাসি। এ সব মিলে বেলির সাক্ষাৎ ব্যাকুল ক'রে তুলল বকুলকে। আকর্ষণ বাড়ল অন্দর মহলের দিকে। কাজে অমনোযোগিতা সৃষ্টি হল। শ্রদ্ধার খাতিরেই সে বেগম সাহেবাদেরকে কোনদিন দেখার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু এখন সে প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখতে পায়। একজনকে ইচ্ছা ক'রে দেখতে গিয়ে অন্যজন গোচরে এসে যায়। তাতে তার ভয়ও হয়। যদি এই চোরা

নজরের ব্যাপারটা হুজুররা কেউ জানতে পারেন, তাহলে সত্যই বড় বিপদ হবে। বিড়াল শিকার করতে গিয়ে বাঘ শিকারের খেসারত দিতে হবে।

বকুলের মনে তুফান আসে। কখনো ভাবে, সে কি বেলির প্রেম-জালে ফাঁসল? একজন দাসীর সাথে একজন গ্রাজুয়েট কেন প্রেম করবে?

---তুইও তো দাস। য্যায়সন কা ত্যায়সন, শুঁটকি কা ব্যায়গন।

---সে কি শিক্ষিতা?

---নাই বা হল। লেখাপড়া তো জানে। সবারই কি সবদিক পাওয়া যায়?

চিন্তা বাড়ে, রাত ছোট হয়। কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, ঘুম লোপ পায়। আশা জাগে, অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা মনকে নিরাশ ক'রে তোলে। অপেক্ষার ঘড়ি লম্বা হয়। আবার কখন দেখা হবে? আবার কখন সাক্ষাতে অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবে?

দু'দিন পর---ঠিক যেন দু'বছর পর বকুল পানের দোকানে দেখতে পেল বেলিকে। আবেগ সংবরণ করতে না পেরে দোকানদারের সামনেই জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, 'কেমন আছ বেলি?'

বেলি উত্তর দিল না। কারণ, বেলি তার পরিণাম জানত। কিন্তু ফিরার পথে সেই গলিতে সে বকুলকে বলল, 'আপনি লোকের সামনে আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন কেন?'

---নিষেধ আছে বুঝি?

---অবশ্যই। বেগম সাহেবা বলেছেন, 'কোন বেটা ছেলের সাথে কথা বলবে না।' জানতে পারলে জানেন তো কী হবে?

---কী হবে শুনি?

---চাকরি চলে যাবে।

---তুমি তো চলে যাবে না। বেলি! তোমার সাথে আমার কথা ছিল।

---কী কথা? খুব লম্বা বুঝি?

---হ্যাঁ। তোমার বাড়ি বর্ধমান তো? তুমি ঈদে বাড়ি যাবে না?

---যাব।

---তাহলে একই ট্রেনে যাব। আর তখনই বলব।

---আমাকে একা যেতে দেবে না। সঙ্গে আমার চাচী থাকবে।

---থাকুক না। অসুবিধা কী?

---অন্য কিছু ভাববে।

---সে দেখা যাবে।

রাস্তা ফুরিয়ে গেল, আলাপনের গাছটিও মুড়িয়ে গেল। বকুল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ঈদ আগমনের।

(৪)

মানুষ যেখানে আশার বাসা বাঁধে, সেখানে সে হারতে চায় না, দমতে চায় না। বকুলের মনে আজ দু-দুটো আশা, দু-দুটো অনাগত আনন্দ।

বড় হুজুর কথা দিয়েছেন, তিনি তার চাকরির ব্যবস্থা অতি শীঘ্রই ক'রে দেবেন।

বেলির আচরণ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে তাকে ভালবাসে। মুখ ফুটে কেউ কাউকে বলতে না পারলেও ফুল-চাপা আনন্দ তাদের মনের মণিকোঠায় মহা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে।

দুই আনন্দের কথা একটিবার বেলিকে জানাতে পারলে তার মনে

আশ্বাস পায়। তার আগে সেই গলি পথে দেখা হলেও অনেক সময় লোকের সামনে বলা যায় না। তাছাড়া পীরবাড়ির কোন মানুষের দৃষ্টিগোচর হওয়ারও ভয় আছে।

ধীরে ধীরে ঈদের সময় এসে গেল। কুরবানীর ঈদ। বেলিকে নিতে এল তার সেই চাচী নফুরা। উঠল তার ভাইয়ের ঘরে। সন্ধ্যায় বেলিকে নিয়ে বাসায় ফিরল। কোন প্রকারে তা টের পেয়ে বকুল তাদের পিছন ধরে বাসা চিনে নিল। এশার পর সে সেই স্ট্রিটে ঘোড়াফিরা করতে লাগল। ওদিকে চাচীও বেলির আচরণে অসাধারণ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করল। হঠাৎ দেখল, বাইরে বের হয়ে এক যুবকের সাথে কথা বলছে। পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল, 'ছেলেটা কে?'

ছেলে নিজেই বলে উঠল, 'সালাম আলাইকুম চাচী! আমি বকুল। হুজুরের বাড়িতে আমিও খাদিম আছি। আমি বেলিকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনারা কাল সকালে কোন্ ট্রেনে যাবেন?

---দানাপুরে। কেন?

---আমিও বাড়ি যাব। আমার বাড়িও বর্ধমান জেলায়।

বেলির অধিকার নেই। তবুও নেহাতই ভালবাসার টানে বলল, 'ভিতরে আসবেন না।'

কথাটা বলেই সে চাচীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অনুমতি প্রার্থনা করল।

---হ্যাঁ, এস, ওরা আবার বাসায় নেই, মার্কেটে গেছে।

ভাই-ভাবীর বিনা অনুমতিতে নফুরা বকুলকে ভিতরে নিয়ে এল। ভাবল, তাদের আসার আগেই কিছুক্ষণের মধ্যে বিদায় নেবে।

চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত ক'রে বেলিকে বলল, 'একটু চা ক'রে দে তো

মা!'

বকুল ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, 'না-না চাচী! আমি চা খাব না। দেরী হয়ে যাবে। হুজুর আবার আমাকে খুঁজবেন।'

এ বাসার বেলি কিন্তু সেই হুজুরের বাসার বেলি নয়। সে ছিল খাঁচার বন্দি পাখী। আর এ যেন উন্মুক্ত বাগানে মুক্ত ময়না। এখানে মাথায় কাপড় নেই। বুকের উপর ওড়নাটাও ফিরফিরে পাতলা। চাচীর চোখে ভাল ঠেকছিল না। কিন্তু একটা সদ্য পরিচিত লোকের সামনে তাকে কিছু বলতেও পারল না।

বেলির চোখে-মুখে আনন্দের স্পষ্ট ছাপ ছিল। ওষ্ঠাধরে ছিল মৃদু-মধুর হাসির ঝিলিক। সেকেলে মহিলারও বুঝতে অবশিষ্ট থাকল না যে, এদের উভয়ের মাঝে আকর্ষণ আছে, ভালবাসা আছে। সুতরাং এ কথা সে কথা বলতে বলতে বলেই ফেলল, 'তুমি ফিরে যাও। হুজুর সাহেব আবার রাগ করবেন।'

'হ্যাঁ যাই' বলে আরো একবার গভীরভাবে বেলির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে মুচকি হাসি বিনিময় ক'রে বের হয়ে গেল। দরজার কাছে বলে গেল, 'আসি তাহলে। কাল ট্রেনে দেখা হবে।'

দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চাচী বেলিকে প্রশ্ন ক'রে বসল, 'হুজুরদের বাড়ির ভিতরে তোদের দেখা-সাক্ষাৎ হতো নাকি?'

বেলি অবাক দৃষ্টিতে চাচীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না-না। ঐ পান আনতে গিয়ে একবার দেখা হয়েছিল।'

চাচী বিশ্বাস না করেই বলল, 'দেখিস্ আবার, পাখ-মারার ঘরে চামচিকার বাসা করিস্ না।'

---কী যে বলে চাচী। এমনি পরিচয় আর কি?

ট্রেনের টাইম হওয়ার বহু আগে থেকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে বসে আছে বকুল। চাচীর সাথে বেলি এসে পৌঁছলে বকুল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। 'চা খাবেন চাচী? শোনপাপড়ি খাবেন চাচী?' উদ্দেশ্য কিন্তু চাচী নয়। তবুও চাচীর মনকে তুষ্ট না করতে পারলে বেলির সাথে নিরিবিলিতে কথা হবে না যে।

চাচী গম্ভীরভাবে বলল, 'না-না। ওসব এখন না। টিকিট কেটে আনো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। আগেভাগে বকুল উঠে সিট দখল করল। জানালার ধারে মুখোমুখি সিট নিল বকুল-বেলি। চাচী বসল বেলির পাশে। পাশে নয়, তবুও আকাঙ্ক্ষিত ধনকে এত কাছে পাওয়ার আনন্দ কম নয়।

দু'জনেরই মনে অনেক প্রশ্ন আছে, অনেক অজানা জানার প্রয়োজন আছে। কীভাবে শুরু করা যায়? ট্রেন ছুটছিল দুর্বার গতিতে, আপন লাইনে। কিন্তু বকুল-বেলির মন ছুটছিল অসীম গতিতে, বেলাইনে। বেলুড়, বালি স্টেশন অতিক্রম ক'রে গেল ট্রেন। বকুলের মন বেলির স্টেশনে পৌঁছতে পারল না। নীরবে বসেছিল, আর তার মুখচ্ছবির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে কোন নেশায় যেন আমেজ গ্রহণ করছিল।

এমন সময় নীরবতা ভঙ্গ করল চাচী। ভালই হল। হঠাৎ বলে উঠল, 'বেলিকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হবে। বড় বেগম সাহেবা বলেছেন। আমি বলেছি, কুরবানীর তৃতীয় দিনে চলে আসবে।'

বেলি বলল, 'তাই হবে। বকুল! আপনি কবে আসবেন?'

---আমিও চলে আসব।

চাচী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বাড়িতে কে কে আছে? মা-বাপ আছে?'

বকুল এবার নিজের পরিচয় বেলিকে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। সে বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, মা-বাপ আছে। একটি বোন আছে। তার বিয়ে দিতে হবে। আমি বি-এ পাশ, তবে বিয়েতে পাশ করিনি। একটি চাকরির খোঁজে কলকাতায় হুজুরের খিদমতে যোগ দিয়েছি। যদি তাঁর অসীলা ও বরকতে একটি চাকরি পেয়ে যাই, তাহলে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখব।'

---পাবে। অবশ্যই পাবে। হুজুরের বুযুর্গি খুব। তাঁর কাছে যে যে আশা নিয়ে আসে, সে খালি হাতে ফিরে যায় না।

কথাটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে বকুল আবার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। তবে এখনও সরাসরি বেলিকে কোন প্রশ্ন করার সাহস হল না তার। চাচীকেই প্রশ্ন করল, 'বেলিকে আপনি নিতে এসেছেন। বেলি আপনার কে হয়? ওর কি কেউ নেই?'

---আছে। মা-বাপ আছে। ওর থেকে ছোট একটি বোন আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। মা-বাপ সেরকম চালাক-চতুর নয়। শহরে কোনদিন আসেনি তো। আমি ওদের পাশের বাড়ির একলা মানুষ তাই।

---আচ্ছা! তাহলে বেলিরও বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে?

---না-না। আসলে যার যেমন ভাগ্য। ওকে একজন পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে। ওরা আসলে গরীব মানুষ তো।

কথাটা বলেই ভুল করেছে বলে মনে হল চাচীকে। এবারে যার কথা শোনার অপেক্ষা ছিল, সে মুখ খুলে বলতে লাগল, 'গরীব না হলে কি কলকাতায় আসি? মানুষের ভাগ্য মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, কার

সাথে তাকে জুড়ে দেয়, ধনীকে গরীব আর গরীবকে ধনী ক'রে দেয়, এতে তো মানুষের হাত নেই।

বেলির অন্তর ফেটে বেরিয়ে আসা কথাগুলি বকুলের ভাঙ্গা অন্তরে গিয়ে গাঁথল। সে মুচকি হেসে বলল, 'ভাগ্য, ভাগ ও ভোগ তো ঠিকই আছে। তবুও মানুষকে চেষ্টা ও তদবীর ক'রে যেতে হবে। জীবনের সাথে লড়াই ক'রে নিজের ভাগকে সুন্দর ক'রে নিতে হবে।'

---সে তো পুরুষরা পারবে। কিন্তু মেয়েরা কী করে বলুন? শিক্ষা না থাকলে অথবা গরীব অসহায় হলে কীভাবে লড়াই লড়বে বলুন?

---ভাগ্যে থাকলে সে লড়াইয়ের সাথী পাবে।

---তাহলে তো সেই ভাগ্যের কথাতেই এলেন।

কথা বলতে বলতে কখন বর্ধমান স্টেশন চলে এল। এখানে অনেকক্ষণ ট্রেন থামবে। বেলি তো নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছে যে, বকুল তাকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু বেলি তাকে ভালবেসেছে কি না, তা অজানা থেকেই গেল। বকুল তাকে বিয়ে করতে চায়। আর এই সময় সে যদি কথাটা বলতে না পারে এবং বাড়ি গেলে যদি তার বাড়ির লোক অন্যত্র বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলে, তাহলে তাকে পছন্দের জিনিস হারাতে হবে।

সুতরাং সুযোগ হাতছাড়া না ক'রে সে মিহিদানা কেনার জন্য প্লাটফর্মে নামল। একটু ঘোরাফিরা ক'রে চাচীকে আড়াল ক'রে সে চোখের ইশারায় বেলিকে নেমে আসতে বলল। বেলিও চাচীর কাছে বাড়ির জন্য মিহিদানা আনার ছলনা ক'রে ট্রেন থেকে নেমে গেল।

বকুল তাকে এক ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে মিহিদানা খেতে বলল। বেলি 'না' করলে সে কথা তুলল। 'দেখ বেলি! আমি তোমাকে

ভালবেসে ফেলেছি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

বেলি কী বলবে কিছু খুঁজে পেল না। মুচকি হাসির চমক দিয়ে মুখ নামিয়ে নিল। আশেপাশে পরিচিত কেউ দেখছে বা শুনছে কি না, তা খেয়াল করতে লাগল।

বকুল বলল, 'কই কিছু বলছ না যে? তুমি কী আমাকে ভালবাসো না?'

---বাসি। কিন্তু আপনার আগে চাকরিটা হোক। আপনার বাড়িতে কথা বলুন। আমার বাড়ি-ঘর পরিবেশ দেখুন, তারপর ফায়সালা নেবেন।

---সে তুমি কোন চিন্তা করো না। আমার চাকরি হলে আমি তোমাকে খুব আরামে রাখব। আমার বাড়ির লোককে আমি রাযী করিয়ে নেব। আর আমি তোমাকে দেখেই যখন মন দিয়ে ফেলেছি, তখন তোমার অন্য কিছু দেখার কী প্রয়োজন আছে? কথা দাও আমাকে।

এই বলে বকুল তার ডান হাতটি বেলির দিকে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বেলি নিজ হাত বাড়িয়ে মুসাফাহাহ ক'রে অঙ্গীকার করতে সাহস পেল না। কী জানি তা লজ্জায়, নাকি অঙ্গীকারবদ্ধ না হওয়ার ইচ্ছায়? অবশ্য বকুল বুঝল তা লজ্জায়। পরিশেষে সে নিজেই তার হাতখানি টেনে নিয়ে সজোরে চাপ দিয়ে ধরে বলল, 'ওয়াদা?'

বেলি মুখ নিচু করেই বলল, 'ওয়াদা।'

---ধন্যবাদ বেলি! ও, আর একটি কথা, ঈদের তৃতীয় দিন যেন অবশ্যই আটটার লোকালে এসে এই স্টেশনে অপেক্ষা করো।

---বেশ। এবারে চলুন। ট্রেন ছেড়ে দেবে। চাচী খারাপ ভাববে।

---আরে তোমার চাচীকে রাঁচি পাঠিয়ে দাও।

---চাচী তো পাগল হয়নি। পাগলামি আপনাকে ধরেছে।

কথাটি বলেই বেলি হাসল। তারপর বলল, 'থামুন! আমি আগে উঠে গিয়ে বসি।'

বকুল অবাক হয়ে বলল, 'বাব্বাঃ! এত ভয়? তাই যাও সুন্দরী।'

পাশে বসলে চাচী জিজ্ঞাসা করল, 'বকুল কই?'

বেলি না জানার ভান ক'রে বলল, 'কী জানি? ট্রেন ছাড়লে ঠিক উঠে আসবে।'

---আর মিহিদানা?

---খুব দাম বলছে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। বকুল এসে বসল। আর এক স্টেশন পরেই তাকে নেমে যেতে হবে। সে চাচীর উদ্দেশ্যে বলল, 'চাচী! এবার তো আমাকে নামতে হবে। আমাদের বাড়ি বেড়াতে চলুন। কাল সকালে আপনাদেরকে রামপুরহাট লোকাল ধরিয়ে দেব।'

চাচী খুশীর সাথেই বলল, 'না বাবা! বাড়িতে বেলির মা-বাপ চিন্তা করবে।'

যথা সময়ে সকলেই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল।

(৫)

বাড়ি ফিরে এসে বেলি পরের দিন মায়ের সাথে মামার-বাড়ি চলে গেল। পরের দিন মা ফিরে এল। বেলি সেখানেই ঈদ করল। মামার-বাড়িতে আব্দার পায়। সেখানে থাকতে সে বড্ড ভালবাসে।

অপর দিকে বকুলের দিন কাটে না। বেলিকে দেখার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাড়ির লোক তাকে ভিন্ন মানুষ রূপে লক্ষ্য করে। কলকাতা যাওয়ার আগের বকুল আর নেই। বোন যেন সেই

'ভাইজান'কে হারিয়ে ফেলেছে। ইমাম সাহেবের মাধ্যমে বাড়ির লোক বিয়ের পয়গামও দিয়েছে। কিন্তু সে বলেছে, 'চাকরি পাওয়ার আগে বিয়েই করবে না।'

একদিন ইমাম সাহেব ঠাট্টা করেই বললেন, 'কী সাহেব! বিয়ের বয়স তো হয়ে গেছে। বিয়ে করবেন না কেন? কলকাতার মেয়ে পছন্দ করেছেন নাকি?'

---কী যে বলেন ইমাম সাহেব! শহুরে মেয়ে কী 'গাঁইয়া' ছেলে পছন্দ করে? শহুরে ছেলেরাই গেঁয়ো ছেলে দেখে নাক সিঁটকায়। তাহলে কোন মেয়ে কি পছন্দ করতে পারে বলছেন?

---আরে মশায়! সব কিছু ব্যবহারে। 'গাঁইয়া' বলে কারো গায়ে লেখা থাকে না, গেঁয়োর কোন গন্ধও নেই। তাহলে যে খাঁটি সে মাটির ঘরেও খাঁটি, পাকা ঘরেও খাঁটি।

---সেটা তো আপনি বলছেন। কিন্তু অহংকারী শহুরেরা তো তা বলে না।

---যাক্ গে। আপনার চাকরির খবর শুনান।

---কই, হুজুর কেবলা তো এখনও পর্যন্ত কিছু করতে পারলেন না। অপেক্ষায় আছি।

---আরে হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। মনকে সুদৃঢ় করুন, একীন রাখুন, হুজুরের উপর ভরসা রাখুন, হয়ে যাবে। হুজুর আপনাকে কোন তাবীয-টাবীয দেননি?

---না তো। তাবীয ব্যবহার করলেও কি চাকরি হবে?

---আরে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। মন চাঙ্গা তো কেটোয় গঙ্গা।'

---এক ওয়াহাবী মৌলবী সাহেব বলছিলেন, এ সব নাকি শির্ক।

---আরে ওয়াহাবীদের কথা বাদ দাও। ডাক্তার-ঘর যাওয়া, মানুষের তৈরি ওষুধ খাওয়া শির্ক নয়, আর পীর-ঘর যাওয়া, তাবীয নেওয়া শির্ক। আওলিয়ায়ে কেরামদের প্রতি ওদের কোন আদব নেই বুঝলেন। হুজুর যদি না দিয়েছেন, আমি লিখে দেব, নেবেন? আমি যে তাবীয দেব, তাতে বেকারের চাকরি হবে, ব্যবসায়ীর লাভ হবে, মামলায় জিত হবে......।

---মা শাআল্লাহ! এতো মহাশক্তির আধার দেখছি।

---কি, বিশ্বাস হয় না?

---অবিশ্বাসের কী আছে। কিন্তু কত লাগবে?

---যা ভাল মনে করেন, দেবেন। শক্তিশালী তাবীয তো।

---আপনারা মশায় খুব মজাতে আছেন। কী সুন্দর যথাসময়ে পাতে ভাত চলে আসে!

---হ্যাঁ, যথাসময়ে ভাত আসে, লাথও আসে। গ্রামের পাঁচজন আমার কথায় চলে না, আমাকে পাঁচজনের কথায় চলতে হয়। এ চাকরির হিংসা করার মতো নয় সাহেব। তাছাড়া বেতন কম। আর তার জন্যই সেলাই মেশিন, তাবীয, মীলাদ আমাদের মতো মানুষদের উপার্জনের অন্য এক পথ। এই তাবীয-মীলাদকে শির্ক-বিদাত বলে ওয়াহাবীরা আমাদের পেটে লাথি মারতে চায়।

---আপনাদের পেটে লাথি মেরে তাদের লাভ কী? সে যাই হোক, এমন কোন তাবীয নেই, যা দিয়ে মেয়ে পটানো যায়?

---আরে! আছে আছে। এমন তাবীয আছে, তা হাতে বেঁধে রাখলে মেয়ে আপনার পেছনে পেছনে ছুটবে! কী? কাউকে পটাতে হবে

নাকি?

---আসলে আমি একজনকে পেতে চাই, কিন্তু মনে হয়, সে আমাকে চায় না। আমি যত কাছে যাই, সে তত দূরে চলে যায়।

---কে সে? দেখুন ভাই! হুজুরদের বাড়ির কোন মহিলার প্রতি আপনি নজর দেবেন না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবেন।

---আরে না-না! আশ্রয়দাতার আশ্রিত হয়ে বাস ক'রে তারই ভাণ্ডারে হাত দেওয়া নেমকহারামি ও খেয়ানত হবে যে। যে চাঁদ আকাশে থাকে, তাকে কি আর ধরা যায়। সেদিকে হাত বাড়ানো বোকামি বৈকি? তার স্নিগ্ধ আলোতে পৃথিবীর অন্ধকারে শোভা আসে, সমুদ্রে জোয়ার আসে ঠিকই, কিন্তু উভয়ের মাঝে বিশাল দূরত্বই স্বাভাবিক। আমি আমার মতো কোন এক মেয়ের কথা বলছি। যাকে আমি আমার একান্ত আপন ক'রে পেতে চাই।

---তাহলে আবার তাবীয কিসের জন্য। আমাকে বলুন, সে কে, কোথাকার? তার বাবার কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে চলে যাই।

---না থাক, সে পরে হবে। কাঁচা ফল খেতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

---আর পাকলে আপনা-আপনি মাটিতে পড়বে।

পরদিন সকালে বকুল গ্রামের শির্কী পরিবেশ-প্রভাবিত আচরণ সাদা মনে গ্রহণ করল। মহাশক্তিশালী দুই তাবীয বাহুতে ধারণ ক'রে চাকরি ও বউয়ের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগল।

কী জানি, বেলি ঐ তারীখে আসবে কি না? সঙ্গে চাচী আসবে কি না? চাচী ছাড়া অন্য কেউ এলে তো আরো মুশকিল। সে চায় কাঁচা প্রেম পাকা করতে, প্রেমের ইটে ঘর গড়তে।

(৬)

সেদিন পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সকাল থেকেই বকুল বসে আছে বর্ধমানের চার নম্বর প্লাটফর্মে। এই প্লাটফর্মেই বেলির ট্রেন এসে থামবে। কিন্তু বিশ্বভারতী পার হয়ে গেল, আরো একটা ট্রেন পার হয়ে গেল, কই বেলি এল না।

কেন এল না সে? নানা দুশ্চিন্তা বকুলের মাথায় এসে তাকে ব্যাকুল ও ব্যগ্র ক'রে তুলল। তার কি অসুখ হল? নাকি অন্য কিছু? যার মনে ভালবাসা আছে, সে তো সময় হওয়ার আগেই প্রতিশ্রুত স্থানে এসে অপেক্ষা করে। তাহলে কি বেলির মনে তার প্রতি ভালবাসার সেই আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি? যে প্রেমের প্রতীক্ষায় রাত পার হয়ে সকাল হতে চায় না এবং দিন পার হয়ে সন্ধ্যা হতে চায় না, সেই প্রেম কি বেলির বালুচরের মতো হৃদয়ে সৃষ্টি হয়নি? ভালবাসার যে সৌরভে মন মাতোয়ারা হয়, সেই সৌরভ কি বেলি-ফুলে স্থান পায়নি?

অবশেষে বেলি এল, তবে সাহেবগঞ্জ লোকালে। তখন বেলা প্রায় একটা। ভেবেছিল সে বেলির প্রতি মনে জমে ওঠা রাগ ঝেড়ে দেবে, কিন্তু যখন দেখল বেলি একা---তার সঙ্গে কেউ নেই, তখন আনন্দে সকল রাগ পানি হয়ে গেল। প্লাটফর্মে নজর পড়তেই ছুটে তার কাছে গিয়ে বলল, 'বেলি! এত দেরী কেন? চাচী আসেনি? তুমি কি একা এলে?'

বেলি হেসে বলল, 'আপনি কি চান না যে, আমি একা আসি?'

---অবশ্যই। সেটাই তো চাচ্ছিলাম। কিন্তু এত দেরী কেন?

---শুনেননি হুজুর-বাড়িতে মাঝে মাঝে হিন্দী ডায়লগ শোনা যায়, 'দের আয়ে দুরুস্ত আয়ে।'

---ঠিক বলেছ। তা বলে কি জানতে পারি না, কেন দেরী হল?

---আমার স্বামীকে বুঝিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল।

কথাটি বলেই বেলি ফুটন্ত গোলাপের মত হেসে উঠল। বকুল বলল, 'মজাক করছ? আমার মত ভাল স্বামী আর তুমি পাবে না।'

গল্প করতে করতে তারা মেন লাইনের লোকালে গিয়ে বসল। বকুলের মনের মধ্যে চরম পুলক, চরম আনন্দ। তবে বেলির মন স্বাভাবিক। সে মনের নদীতে কোন উচ্ছ্বাস নেই, কোন উত্তাল তরঙ্গ নেই। তবুও বকুলের তরঙ্গেই তার মনও প্লাবিত। হাবুডুবু খেতে লাগল উভয়ের মন। বাইরে থেকে যারা দেখে, তারা মনে করে, ওরা বুঝি নব পরিণীত বর-বধূ। বলনে চরম আবেগ, চাহনিতে চরম আকর্ষণ, পাশ-ঘেঁসে বসাতে চরম পুলক।

বকুল বেলির হাতটা নিজের জাঙ্গের উপর টেনে নিয়ে কথা বলছিল। হঠাৎ দেখল, বেলির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি। প্রশ্ন করল, 'এটা কিনলে?'

বেলি মিষ্টি হেসে বলল, 'বন্ধু দিয়েছে। আর এটার জন্যই দেরী হয়ে গেল। কথা ছিল, বিশ্বভারতী ট্রেনে দিয়ে যাবে। কিন্তু কোন কারণে সেই দেরী ক'রে দিল।'

---তোমার বুঝি বন্ধু আছে?

---কত আছে? তিন-চারটে মেয়ে আমার বন্ধু।

---সেই ভাল।

ট্রেন ছুটছিল। ট্রেনেই তারা কলা ইত্যাদি খেয়ে দুপুরের খাবারের কাজ সারল। বকুল প্রস্তাব রাখল, 'বেলি! তুমি কি কলকাতার কোন দেখার জিনিস দেখেছ?'

---কে দেখাবে?

---চল, আজ তোমাকে কলকাতা দেখাব। শুনেছ, পাতাল-রেল চালু হয়েছে?

---শুনেছি। কিন্তু দেরী হয়ে গেলে যদি হুজুররা কিছু মনে করেন?

---আরে না-না। তাঁরা জানতে পারবেন না।

---আমার মা বলে, হুজুরদের সব মালুম আছে। তাঁরা সব গোপন খবর বলতে পারেন।

---ধুৎ! এত বড় অন্ধবিশ্বাসিনী হয়ো না।

পীরের খাদিমের পীড়াপীড়িতে বিলাস-বিহারে যেতে খাদিমা রাযী হয়ে গেল। হাওড়া স্টেশনে নেমে গাড়ি ধরে তারা সোজা চলে গেল ধর্মতলায়। সেখানে পাতাল-রেলের স্টেশনে নামতে চলমান সিঁড়ি আছে। বেলি বলল, 'আপনি ওতে নামুন। আমি সাধারণ সিঁড়ি বেয়ে নামি।'

বকুল বলল, 'ভয় নেই। সাথে আছি না? সাথে নামব, সাথে চাপব।'

অতঃপর বেলির দুই বাহুতে ধরে উভয়ে চড়ল সেই সিঁড়িতে। মনের পুলকে বেলিও যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিল। প্লাটফর্মে কত অর্ধনগ্ন সুন্দর-সুন্দরী। টিভি চলছে, তাতে চলছে রোমান্টিক ছবি। তাদের চোখে আজ সব কিছুই যেন রোমান্টিক। মৃত্তিকা-গর্ভে আলোয় সাজানো এ যেন মন-মাতানো পরিবেশ।

বকুল বলল, 'চল আমরা এক জায়গায় বসে গল্প করি।'

কিন্তু বেলির মনে ভয় আছে। সে শহরে গুণ্ডাদের কথা শুনেছে এবং ছবিতে দেখেছে। সুতরাং সেই ভয় প্রকাশ ক'রে বলল, 'না-না, অন্য কোথাও চল।'

পাতাল রেলে চড়ে তারা পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে নামল।

বকুল বলল, 'চল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পার্কে যাই অথবা ইডেন গার্ডেনে যাই।'

বেলি বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে, হুজুরের বাড়ি ফিরতে রাত হলে ওঁরা সন্দেহ করবেন।'

---বেশি নয়। সামান্য ক্ষণ। একটু বসে গল্প ক'রে চলে আসব।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের চত্বরে যে সব পার্ক আছে, তার কোন একটাতে দু'জনে বসে কত কি গল্প করল। বকুলের মনকে বেলি অধিকভাবে জয় ক'রে নিল। রানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-সৌধের মত তার সরল মনেও বেলির প্রেমের স্মৃতি-সৌধ নির্মিত হল।

সঙ্গ কি ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয়? আবার একান্তভাবে কখন দেখা হবে? কীভাবে হবে? ইত্যাদি জল্পনা-কল্পনা করতে করতে ট্রামে ফিরল নিজেদের ঠিকানার কাছাকাছি। চালাকি ক'রে বকুল বেলিকে আগে পাঠিয়ে দিল। সে হুজুর বাড়িতে প্রবেশ করল প্রায় রাত বারোটায়। সুতরাং তাদের সম্পর্কের কথা কেউ কিচ্ছুও বুঝতে পারল না।

বেলি ফিরে এল সেই চৌহদ্দির ভিতরে, তার সাথে ফিরে এল নামায, ফিরে এল মাথার কাপড়। হুজুর-বাড়ির মহিলারা পূর্ণ পর্দা করেন। তাঁরা স্বামীর ভাই-বুনাইদেরকে দেখা দেন না। কিন্তু তাঁদের নিকট থেকে বেলি সে পর্দার ট্রেনিং পায় না, যেহেতু সে দাসী। তার পক্ষে পরিপূর্ণ পর্দা পালন করা বড়ই কঠিন। তাই সম্ভবতঃ তার ক্ষেত্রে 'চেহারা দেখানো জায়েয'-এর ফতোয়াই কার্যকর। যদিও তাঁদের বাড়ির বাইরে তার মাথায় কাপড়ও থাকে না। যেহেতু যে কাজ লোকের ভয়ে হয়, সে কাজ ঐ লোকের দৃষ্টি-সীমানার মধ্যেই সীমিত থাকে। পক্ষান্তরে যে কাজ আল্লাহর ভয়ে হয়, সে কাজ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে

করা সহজ হয়ে যায়।

আর বকুল যদিও দেশের বাড়িতে নামায পড়ে, তবুও বেলির সাথে বেড়ানোর ফলে সেদিন সারাদিন কোন নামায পড়েনি। ঠিকই তো, রাম বলা আর ধুতি তোলা---একই সাথে কি সাজে? চাকরির দরখাস্ত সে আল্লাহর কাছে দেয় না, কারণ তার দরখাস্ত তার ধারণা মতে আল্লাহর খাস ওলীকে দিয়ে রেখেছে। আর ভরসাও রেখেছে সেই ওলীরই উপর।

(৭)

নারী-প্রেমের একটা বদ নেশা আছে। সেই নেশা প্রেমিককে প্রেমিকার নিকটবর্তী করতে চায়। চোখের নিকটে, মুখের নিকটে, বুকের নিকটে। কিন্তু নৈকট্য প্রাপ্তিতে যখন বাধা পড়ে, তখনই শুরু হয় দহন জ্বালা।

যদিও পানের দোকানে এবং অতি সামান্য পথের গলিতে ভয়ে ভয়ে তাদের আপোসে দেখা-সাক্ষাৎ ও সামান্য কথা-বার্তা হয়, তবুও সেই তৃপ্তি নেই, সেই পুলক নেই, সেই আনন্দ নেই।

অনেক দিনই পার হয়ে গেল। বকুলেরও চাকরিও হল না, বেলির বরও মিলল না। বকুল প্রস্তাব দিল, এখান থেকে তারা বাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়ে ক'রে সংসার করবে। কিন্তু বেলি বলে, 'আপনার চাকরিটা হোক, তারপর বিয়ে করব।'

কিন্তু কবে হবে তা? ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। একদিন সে বেলিকে বলেই ফেলল, 'দেখ বেলি! আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। আর তুমি যদি আমাকে পেতে চাও, তাহলে বাড়ি ফিরে যাও। এখানেও জানাজানি কানাকানি হয়ে যাচ্ছে। না হয় চলো, কোর্টে বিয়ে ক'রে

আসি।'

বেলি বলল, 'কক্ষনো না, চোরের মত পালিয়ে বিয়ে করব না। বিয়ে করতে হলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আনন্দের সাথে বিয়ে করব।'

---কিন্তু তোমার মা-বাপ যদি রাযী না হয়?

বেলি নিশ্চিত জানে, তার মা-বাপ অবশ্যই এমন জামাই পেয়ে খোশ হবে। তাই নিশ্চয়তা দিয়েই বলল, 'আমার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মা-বাপ অবশ্যই রাযী হবে। কিন্তু আপনার মা-বাপ যদি রাযী না হয়, তাহলে?'

---আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার আত্মীয়র মাঝে তোমাকে বিয়ে করব। আর আশা করি, তারা তোমাকে দেখলেই রাযী হয়ে যাবে।

সুতরাং একদিন বেলি হুজুর-বাড়ি থেকে বিদায় নিল। 'বিয়ে হবে' এই অজুহাত দেখিয়েই হুজুরের পরিবারের নিকট থেকে চিরবিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়িতে বিয়ের কথা বললে তার মা-বাপ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হল। নিতে লাগল বিয়ের প্রস্তুতি।

কিন্তু এখনো কথা পাকা নয়। কারণ বকুল বলেছিল, তার একটিমাত্র বিয়ের উপযুক্ত বোন আছে। হয়তো তার বিয়ে আগে দিতে হবে। সুতরাং তার চিঠি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে তার চিঠিও এসে গেল। তাতে লেখা ছিল,

'প্রিয়তমা বেলি!

আশা করি, কুশলে আছ। আমার আব্বা-আম্মা আমাদের বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন। অতএব তোমার আব্বাকে আগামী ১৫ ফাল্গুন আমাদের বাড়ি এসে বিয়ের কথা পাকা ক'রে যেতে অনুরোধ কর। অপেক্ষার ঘড়ি চলতে চায় না। হুজুরের দুআয় ভাল থেকো।'

ইতি---

তোমার মনকারাগারে বন্দি বকুল

বেলির আব্বা চামেলি ও জামাইকে ডেকে পরামর্শ করল। বেলির মা জামাইকে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু জামাই দু'টি ওজরে যেতে আপত্তি জানাল। এক ঃ সে বাংলা ভাল জানে না। আর দুই ঃ সে তার দোকান বন্ধ করতে পারবে না, কারণ বড় ছেলে দেশে গেছে।

অগত্যা বেলির আব্বা একাই অজানা-অচেনা পথে হবু বিয়াই বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বেলা দশটার মধ্যে পৌঁছে গেল সেই গ্রামে। ভাল গ্রাম। বিয়াই-বাড়িও ভাল। ভাল বিয়াই ও জামাইয়ের ব্যবহার। বাড়ির সবাই নামাযী। বড় খুশীর ব্যাপার যে, ঐ দিনে ইমাম সাহেবেরও দাওয়াত। বড় আশাবাদী মন নিয়ে বেলির আব্বা দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিয়ের কথা তুলল। জামাইয়ের প্রশংসা করলেন খোদ ইমাম সাহেব।

বেলির আব্বা বিয়ের দিন করতে বলল। কিন্তু বকুলের আব্বা বলল, 'তার আগে দেনা-পাওনা ঠিক ক'রে নিন বেয়াই মশায়!'

দেনা-পাওনা? হঠাৎ বেলির আব্বা যেন আকাশ থেকে পড়ল। যেহেতু বেলির মুখে শুনে মনে হয়েছিল, এ বিয়ে বিনা পণেই হবে। তাহলে মনে-মনে জোড়া লাগার বিয়েতে আবার পণের কথা কেন? ক্ষণকাল নীরব থাকার পর ঢোক গিলে বলল, 'দেনা-পাওনার কথা আপনারাই বলুন। আমরা তো গরীব মানুষ।'

ইমাম সাহেব বলে উঠলেন, 'গরীব মানুষ হলেও আজকাল আর যৌতুক ছাড়া কার বিয়ে হচ্ছে বলুন? আর যা দেবেন, তা তো বেটি-জামাই-ই ব্যবহার করবে।'

বেলির আব্বা বলল, 'আপনাদের দাবী-দাওয়া কী বলুন, তারপর ভেবে দেখব।'

---বেশি কিছু নয়, সাইকেল, ঘড়ি, বিশ হাজার টাকা। আর মেয়েকে এক ভরির গয়না।

ইমাম সাহেব ওকালতি ক'রে বললেন, 'ছেলে চাকরি পেলে মোটর সাইকেল দাবী করত।'

---আপনি আলেম মানুষ হয়েও ঐ কথা বলছেন?

---কেন? আপনি নেননি বা নেবেন না? এখন তো আলেম-যালেম সবাই নিচ্ছে।

---সবাই নিলেই কি হারামটা হালাল হয়ে যাবে?

---ও হারাম-হালাল দেখতে গেলে বাপু বেটির বিয়ে হবে না।

বেলির আব্বা এবার হবু বিয়াইকে সম্বোধন ক'রে বলল, 'ভাইজান! আমি গরীব মানুষ। এ গরীবের প্রতি রহম ক'রে আমার মেয়েকে বউ ক'রে ঘরে তুলে নিন। বকুল বাবাজীর পছন্দ বলেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। আমার তো অত কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই।'

বকুলের আব্বা বলল, 'দেখুন সাহেব! আমি আপনাকে রহম করলেও, আমাকে তো কেউ রহম করবে না। আমারও উপযুক্ত মেয়ে আছে বাড়িতে। তারও তো বিয়ে দিতে হবে। আমি আপনার মেয়েটা বিনা পয়সায় বউ ক'রে ঘরে তুলে আনলে কি আমার মেয়েটাকে কেউ বিনা পয়সায় তার ঘরের বউ ক'রে তুলে নিয়ে যাবে?'

বেলির আব্বার অবস্থা ডানা ভিজা পাখির মত হয়ে গেল। সে আর কী বলবে? নিরাশ মনে ভাঙ্গা গলায় কাঁপা কাঁপা কান্না-ভেজা শব্দে শুধু বলল, 'তাহলে আমার আসাটাই ভুল হয়ে গেছে।'

---আপনি বাড়ি ফিরে যান। তারপর বিয়ান ও আরো আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরামর্শ ক'রে দেখুন। মতামত চিঠিতে জানাবেন।

'ঠিক আছে'---বলেই উঠে পড়ল বেলির আব্বা। দু'চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগল। কোন রকম সংবরণ ক'রে বিদায় নিয়ে স্টেশনের দিকে মাঠের চলা পথে আর কান্না সামলাতে পারল না। কাপড়ের রুমালে অশ্রু মুছতে মুছতে স্টেশনে এল। মেয়ের অনেকটা বয়স হয়েছে। মেয়েকে কী বলে জবাব দেবে সে? লজ্জায় ও অপমানে তার মনে কুচিন্তা আসতে লাগল। মনে হল, দ্রুতগামী ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আত্মহত্যা করবে। হঠাৎ একটি লোক এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দানাপুর কি পার হয়ে গেল?'

সব কিছু চাপা দিয়ে জবাব দিয়ে বলল, 'মনে হয় পার হয়নি। আমিও যাব ঐ ট্রেনে।'

---আপনার চোখ ঝলঝল করছে। কিছু হয়েছে?

---কী আর হবে। কন্যাদায়ে পড়েছি ভাই।

---সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিলেন বুঝি?

---হ্যাঁ। দেনা-পাওনার খাঁই খুব বেশি!

---বর্তমান পরিবেশে তাই তো হয়েছে। আমাদের মত গরীবদের মেয়ের বিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কী করব? আমি আমার তিন তিনটে মেয়ের বিয়ে দিলাম কাশ্মীরে। সব বিনা পয়সায় হয়েছে। আমাদের গ্রামের আরো দ'টো মেয়ের বিয়ে বোম্বাইয়ে হয়েছে। হলেই বা অবাঙালী, মেয়েরা সুখে আছে। অবশ্য বিয়ের নামে দু'নম্বরীও হচ্ছে। এখান থেকে নামকে ওয়াস্তে বিয়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে বোম্বাইয়ে কোন শেঠের হাতে অথবা কোন নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি ক'রে দিচ্ছে।

সেখানে তারা যৌন-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

কত মেয়ে আত্মহত্যা করছে। ঐ দেখুন ঠিক ঐ জায়গাতে একটি মেয়ে ছুটন্ত রাজধানী এক্সপ্রেসের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল। বিয়ের পরে পাওনা বাকী ছিল। শ্বশুর-বাড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে নিজের জীবন খুইয়ে দিল!

অনেকে পরিকল্পিতভাবে বধূহত্যাও করছে। অনেকে প্রেমের নামে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রী ক'রে স্ত্রীকে পণবন্দী বানিয়ে যৌতুক আদায় করছে। অনেক মেয়ে বিয়ের পরেও বাপের ঘরে পড়ে রয়েছে।

হুঁঃ! গত জুম্মার খুতবাতে আমাদের ইমাম সাহেব জাহেলী যুগের কন্যা হত্যার কথা বলছিলেন। তারা বর্বর ছিল। কিন্তু কেন বর্বর ছিল? তারা কি অকারণেই মেয়েকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত? নিশ্চয় বড় কারণ ছিল। আজ মেয়ে নিয়ে কত লাঞ্ছনা, কত কষ্ট? আজও অনেকে হত্যা ক'রে ফেলছে, কেউ হত্যা করছে পেটে থাকা অবস্থায়, কেউ করছে বড় অবস্থায়। আরে বিদেশীর হাতে বিক্রি ক'রে দেওয়া কি মেরে ফেলা নয়? মেয়েকে ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দেওয়ার চাইতে কি মেরে ফেলা বেশি ভাল নয়? আরে সে যুগের বর্বরতা এবং আজকের যুগের বর ও বরের বাবার বর্বরতার মধ্যে কতটুকু আর পার্থক্য আছে?

আগের যুগে লোকে বলত, 'কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে।' কিন্তু বর্তমানে টাকা ঢালতে হয় বলে অনেকে নিজের মেয়েকে স্বয়ংবরা করছে, তাকে তার বর খুঁজে নিতে সুযোগ দিচ্ছে! কিন্তু শেষে পাচ্ছে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা।

অনেকে আবার মেয়েকে স্বনির্ভর করছে। তাতে অবশ্য বরপক্ষ আকৃষ্ট হবে। আরে আপনি যে কাঁদছেন? ধুৎ মশায়! মেয়েকে বিড়ি

বাঁধতে শিখিয়ে দিন। দেখবেন, কত লোক বউ ক'রে নিয়ে যাবে।

এতক্ষণ বক্তৃতা শোনার পর বেলির আব্বা মুখ খুলল। বলল, 'বিড়ি বাঁধা আবার হারাম বলছে যে। বলছে, বিড়ি খাওয়া হারাম, বিড়ি বাঁধা হারাম।'

---ধুৎ! হারাম-হালাল দেখলে পেট চলবে? মেয়ের বিয়ে হবে? বড় লোকরা সূদের টাকা জামাইকে দিচ্ছে না? বিড়ির টাকা দিয়ে মাদ্রাসা-মিশন চালাচ্ছে না?

---তবুও মুসলমান হিসাবে যতটা পারা যায়, মানা ভাল নয় কি?

---ঠিক আছে শাড়ির কাজ শিখিয়ে দিন। শাড়িতে নক্সা ক'রে আজকাল বহু টাকা কামানো যায়। আর পুঁজি থাকলে বাড়িতে সেলাই-মেশিন কিনে দিন। আজকাল সব কথাই ফাঁকা, আসল কথা টাকা। মেয়ে টাকা আনতে পারলে, তাকে বউ ক'রে আনতে বরপক্ষের কোন বাধা থাকবে না।

---আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু বড় দুঃখের কথা, ঐ গ্রামের ইমাম সাহেবও যৌতুককে সমর্থন করছিলেন!

---আরে মশায়! সবাই পরিবেশের দূষণের শিকার। এখন 'কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে কে মানে কাহার বোল?'

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেলে কথোপকথনের ইতি পড়ল। কিন্তু বেলির আব্বা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। শঙ্কিত মনে বাড়ি ফিরল, যেখানে সবাই আশা ও আশঙ্কার মাঝে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল।

(৮)

প্রত্যাখ্যানের খবর শুনে বেলি মুষড়ে পড়ল। তবে সে নিরাশ হল

না। কারণ, সে জানত, বকুল তাকে কতটা ভালবাসে। সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল, অপেক্ষা করতে লাগল বকুলের চিঠির, একজন প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের ভূমিকার, একটি আশাভরা হৃদয়ের প্রতি একটি আশাবাদী হৃদয়ের কর্তব্যের।

এর মধ্যে সে মামার বাড়ি বেড়াতে চলে গেল। কী জানি কেন? তার মনে কোন দুঃখ নেই, বরং মনে হচ্ছে, সে যেন বড় আশাবাদিনী। পূর্বের মতোই তার মনে চাঞ্চল্য আছে, বলনে-চলনে চপলতা আছে, তারুণ্যের ক্ষিপ্রতা আছে, হাসি মুখের ঔজ্জ্বল্য আছে। নেই নিরাশা, নেই আকুলতা, নেই মলিনতা। সে যেন এক নির্ভীক সাহসী যুবতী।

সপ্তাহ খানেক পর বাড়ি ফিরে শুনল, চিঠি এসেছে। সে চিঠি তারই নামে, তাই সেই প্রথম খুলে পড়ল। তাতে লেখা ছিল,

'প্রিয়তমা লায়লী!

আমার সালাম নিয়ো ও তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিয়ো। তোমার আব্বা হয়তো দুঃখ পেয়েছেন অথবা তোমরা হয়তো নিরাশ হয়েছ। তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি বিনা পণে বিয়ে করার চেষ্টায় আছি। কিন্তু পরিবেশ গুণে আমার আব্বা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। আমার মা ও বোনকে রাযী ক'রে ফেলেছি। কেবল আব্বাকে পারছি না। আমি বলি কী, কোন প্রকারে ধার-দেনা ক'রেও বিশ হাজার টাকা যোগাড় ক'রে আমার আব্বার হাতে দিয়ে দাও। পরে আমি ফেরৎ দিয়ে দেব। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচার আশা করি না প্রিয়ে! তুমি আমার প্রতি ভরসা রাখো। সত্বর উত্তর জানিয়ে সান্ত্বনা দেবে। আমি তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকলাম।'

ইতি---তোমার মজনু, বকুল

বেলি চিঠি পড়ে দুঃখ পেল। নিজের অজান্তে তার চক্ষু হতে অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগল। বুঝতে পারল, বকুল কত দুর্বল, কত অসহায়। হয়তো-বা চাকরিটা হলে এত নিরীহ থাকত না। কিন্তু তাদের উপায় কী? হয়তো-বা একমাত্র উপায় হল তাই, যা বেলি চায় না। তাছাড়া কোর্টে বিয়ে ক'রে যদি বাড়ি ঢুকতে না দেয়, তাহলে তখন কী হবে? লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় কোথায় বাস করতে হবে, পরের বাড়িতে থেকে কত লাঞ্ছনা সইতে হবে, কত আত্মীয় পর হয়ে যাবে, সমাজের চোখে সে 'ঢেমন' নামে খ্যাত হবে, কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে সংসার করতে হবে, সুযোগের মাথায় সেই কথা ধরে অনেকে খোঁচা দেবে, ছেলেমেয়েদের বংশে লোকে খোঁটা দেবে, আরো কত কী। সুতরাং সে পথ সে কেন গ্রহণ করবে?

কিন্তু উপায় কী? তাহলে তাকে কি বকুলকে হারাতে হবে? বকুল কি কোনক্রমেই তাকে বিনাপণে বিয়ে করতে সক্ষম নয়? নারী তো দুর্বল, চিরদিন সে পুরুষের করুণার পাত্রী, পুরুষের মুখাপেক্ষিণী, তাহলে তার কি করার আছে?

বেলি চিঠি লিখল বকুলকে। মনের কথা, পরিস্থিতির কথা, প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে দিল। কিন্তু সে চিঠি বকুলের হাতে না পড়ে তার বোনের হাতে পড়ল। সে বাপ-মাকে দেখিয়ে গোপন ক'রে নিল। সুতরাং এক যুবতী অপর যুবতীকে বঞ্চিতা করতে উক্তরূপ বড় ভূমিকা পালন করল!

বকুল চিঠির প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় অধীর হয়ে দিন গুনতে লাগল। দু'সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেলে সে অধৈর্য হয়ে উঠল। এবারে সে ঘরে রাগ দেখাতে শুরু করল। প্রকাশ্যে বলল, 'তোমরা যদি বেলির সাথে

আমার বিয়ে না দাও, তাহলে জেনে রাখ যে, আমি বিয়ে করছি না।'

আব্বা বলল, 'পণ না নিয়ে আমিও বিয়ে জুড়ছি না। নচেৎ তুমি টাকা নিয়ে এসো, তারপর বিয়ে কর। মাথার ওপরে একটা বোন উঠেছে, তাও তো নজরে ঠেকা দরকার। এতদিন হল একটা চাকরিও তো যোগাড় করতে পারলে না। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত আমাকে কি জমি বিক্রি ক'রে তোমার বিয়ে দিতে হবে?'

---তারা তো পণ দেব না বলেনি।

হঠাৎ ক'রে বিলকিস মুখ ফস্‌কে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া! তারা কিছু দিতে পারবে না বলেছে।'

---তুই কী ক'রে জানলি?

ভয় পেয়ে আমতা আমতা ক'রে চিঠির কথা গোপন ক'রেই বলল, 'ঐ যে ঐ দিনই তো বেলির বাবা বলে গেছে।'

---কিছু দিতে না পারলেও আমি বেলিকেই বিয়ে করব।

মা বলল, 'তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? বেলি, বেলি, বেলি, আর বেলি। বেলি ছাড়া কি আর কোন মেয়ে নেই দুনিয়াতে? ফকীরের মেয়েই তোর পছন্দ হল?'

---পছন্দের মেয়ে ফকীরের না আমীরের তা দেখা হয় না মা! তাকে দেখলে তোমরাও পছন্দ করতে।

---দরকার নেই অমন পছন্দের। শুধু রূপ দেখলেই হবে?

---রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজত্বও চাই বলো?

---পাওয়া গেলে ক্ষতি কী? রূপসী বউ নিয়ে কি গাছতলায় বাস করবি নাকি?

(৯)

সেদিন লম্বা কথা কাটাকাটির পর বকুল আকুল মনে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও করল না। স্থির করল, সে কলকাতায় ফিরে যাবে। কিন্তু স্টেশনে গিয়ে প্লাটফর্মে বসে ভাবতে লাগল বেলির কথা। ভাবতে লাগল নিজের স্বপ্নভঙ্গের কথা। চাকরিও হল না, ব্যবসা করার মতো পুঁজিও নেই। তাহলে উপায় কী? ভাবল, বিয়ের পর হুজুরদের বাড়িতেই ফিরে যাবে। সেখানে যদি একটি রুমের ব্যবস্থা ক'রে দেন হুজুররা, তাহলে সেখানেই চাকরির অপেক্ষায় কাটানো যাবে। কিন্তু মা-বাপ ও বোনটির কী হবে? ইমাম সাহেবের তাবীযে কোন কাজ হল না, হুজুরদের দুআতেও কোন ফল ফলল না, চাকরি কী আর দুআ-তাবীযে পাওয়া যায়? চাকরির জন্য ব্যাকিং চাই, ঘুস চাই, ডোনেশন চাই। কেবল যোগ্যতার বলেও চাকরি মেলা ভার। আবার যেখানে বর্ণ-বৈষম্য আছে, সেখানে চাকরি তো আকাশ-কুসুম অথবা মায়া-মরীচিকা।

প্লাটফর্মেই সে সিদ্ধান্ত নিল, বেলিকে একবার দেখা করবে। আর একবার সে অনুরোধ করবে কোর্ট-ম্যারেজ করার জন্য। তাতে রাযী না হলে তাদের গ্রামে তাদের বাড়িতে থেকেই তাকে বিয়ে করবে। তার মা-বাপ তো রাযী আছে।

কোন সামাজিক চাপের ভয় বা লজ্জা বকুলকে জড়িয়ে ধরল না। 'কিসের লজ্জা কিসের ভয়, প্রেম-পিরীতে সবই সয়।'

সুতরাং সে সব কথা না ভেবে আপ ট্রেনের টিকিট নিয়ে শির্কী মনে হুজুরকে স্মরণ ক'রে সে বেলির গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। গ্রাম ঢুকতেই

এক তরুণের সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বেলিদের বাড়িটা কোথায়?'

---কোন্ বেলি? এ গ্রামে দু'-দু'টো বেলি আছে।

---ঐ বেলি, যে কলকাতায় থাকত।

---ওহো, তাই বুঝি? আপনি কি ওদের আত্মীয় হন?

---এক রকম তাই।

---আপনিও কলকাতায় থাকেন নাকি?

---হ্যাঁ। কিন্তু বাড়ি কলকাতায় নয়।

---বুঝেছি। আপনার নাম বকুল নয়?

---আপনি জানলেন কীভাবে?

---আপনাদের হুজুররাই কেবল গায়বের খবর জানেন, আর অন্য কেউ জানতে পারেন না বুঝি?

---ঠাট্টা করছেন?

---না-না, বেলি আমাকে বলেছে। আমি তার কুরআনের মাস্টার তো।

---তাহলে সে আপনাকে কি আমাদের ব্যাপারে সব কিছু বলে ফেলেছে?

---সব কিছু না হলেও, কিছুটা বটে।

---মাস্টারদের কাছেও কি এ সব বলতে হয়?

---বলার মতো আর কাউকে না পেলে মন হাল্কা করার জন্য মানুষ বলে ফেলে।

বকুলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে বেলির কুরআনের মাস্টার রফিকুল গলা ঝেড়ে বাড়ির ভিতরে গেল। তখন বেলি এক মনে গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইতে গাইতে রুমালে ফুল তুলছিল। মাথায় কাপড় তুলে নিয়ে

বেলি বলল, 'এসো ভাই! কিছু বলবে?'

---তোমাদের মেহমান এসেছে। বকুল।

---বকুল এখানে এসেছে? তুমি মজাক করছ। এখনো বিয়েই হল না, সে এখানে কেন আসবে?

রফিকুল হেসে বলল, 'বিয়ে করতে এসেছে হয়তো।'

---তাই আবার হয়?

বেলি মা-সহ ছুটে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, সত্যই সেই প্রেম-পাগলা মানুষটি সলজ্জ শরীরে দাঁড়িয়ে আছে।

মা-বেটিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরিস্থিতির সামাল দিতে বেলি ছুটল পাশের বাড়ি চাচীর কাছে। চাচীকে বকুলের আসার কথা জানালে সে-ও হতভম্ব হয়ে উঠে বাইরে এল।

বেলির মা তাকে বলল, 'কী করা যায় বল তো?'

রফিকুলের উদ্দেশ্যে বলল, 'বকুলকে আমার ঘরে নিয়ে এসে বস।'

বেলি ও তার মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু তারপর?

কুশল জিজ্ঞাসার পর শরবত চায়ের অভ্যর্থনা-পর্ব শেষ হল। নফুরা বলল, 'তুমি এখানে কেন এলে বাবা? লোক জানাজানি হয়ে বড় কেলেঙ্কারি হবে জানো না?'

---আমি বেলিকে বিয়ে করতে চাই চাচী।

---কিন্তু এটা তো নিয়ম নয়। লোকে তো খারাপ ভাববে।

---কী করব? নিয়ম মেনে তো পারা গেল না। নিয়ম মানতে গিয়ে অন্য এক অনিয়মের শিকার হয়ে আমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাচ্ছে চাচী।

ইতিমধ্যে বেলি ও তার মা এ ঘরে এল। আব্বা বাড়িতে নেই, কাজে গেছে। চাচী বেলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবি তুই?'

বেলি যেন বিরক্তিভরা সুরে বলল, 'এইভাবে কি বিয়ে হয় নাকি?'

বকুল বলল, 'কেন হয় না বেলি? বিরাট খরচ ও ধুমধাম ক'রেই শুধু বিয়ে হয় বুঝি?'

বেলি বলল, 'কোথায় রাখবেন আমাকে? কী খাওয়াবেন আপনি?'

---আমি যেখানে থাকব, সেখানেই থাকবে, আমি খেলে তুমি খাবে। আমি মরলে তুমিও মরবে।

---আপনি মরলে আমি কেন মরতে যাব? তার চাইতে আগে চাকরি বা কাজ দেখে নিন। তারপর এসে বিয়ে করুন।

---আমার ভয় হয়, আমি হয়তো তোমাকে হারিয়ে ফেলব।

বেলির কথাগুলো কড়া লাগছিল। কিন্তু সে হয়তো এখন থেকেই ভালবাসার অধিকার ফলাচ্ছিল। রফিকুল বকুলের পক্ষ নিয়ে বলল, 'বিয়ের পরেও তো চাকরি দেখা যায়। বিয়ে হলেই যে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হবে, তার মানে নেই।'

বকুলের চোখে অন্তর্বাষ্প অশ্রু হয়ে ঝলমল করছিল। রফিকুল তা খেয়াল ক'রে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আপনি নিরাশ হবেন না। বেলির বাপের সাথে আলোচনা ক'রে দেখি।'

বেলি এইভাবে বিয়েতে রাযী নয়। তার আম্মা চায়, আব্বা চায়। গরীবের মেয়ে কোন প্রকার হিল্লে হয়ে গেলে তারা বেঁচে যায়। কিন্তু সমাজ?

রফিকুল ছুটল ইমাম সাহেবের কাছে। যোহরের নামাযের পরে মোড়ল-মাতব্বরদের সাথে পরামর্শ করল। রফিকুলও মাদ্রাসার ছাত্র। সে বিয়ের পক্ষে-বিপক্ষে কিছুতে ছিল না। তবে বেলির মা-বাপের প্রতি সহানুভূতি অবশ্যই ছিল। সকলেই বলল, 'আসলে কলকাতাতেই

ওদের মনে মনে মিল, লেগে গেছে খিল। এখন গরীবের মেয়ে উদ্ধার হয়তো হয়ে যাক। আমরা লোক ডেকে বিয়ে পড়িয়ে দেব।'

সন্ধ্যা বেলায় বেলির আব্বা এলে সমস্ত খবর বলা হল। বেলির আব্বা সায় দিল। বেলির মা ও বকুল খোশ হল। কেবল খোশ হল না বেলি। কী জানি? তার মনের ভিতরে অন্য কোন্ তুফান চলছিল। সে একে-ওকে জিজ্ঞাসা করছিল। রফিকুলকেও মাস্টার হিসাবে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ধরনের বিয়েতে কি আমি সুখী হতে পারব?'

রফিকুল বলল, 'সেটা তো তোমার ভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া আমরা তো আর ছেলে চিনি না। বাহ্যতঃ ভাল বলেই তো মনে হয়। আর সে তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেই বলে কোন সংকোচ-লজ্জা না ক'রে গায়ে পড়ে বিয়ে করতে এসেছে। এটা কোন অন্যায় বা আইন-বিরোধী কাজও হচ্ছে না। বিয়ের পরে তোমরা কোথায় থাকবে, হয়তো বা এখানেই থাকতে হবে---সেটা তো নিশ্চিত কিছু নয়। এখন তোমার মা-বাপের বোঝাও হাল্কা হয়ে যাবে। সেই হিসাবে আমার মনে হয়, তুমি যখন তাকে সৌরভ দিয়েছ, তখন ফুলও দাও। বকুল ফুল ও বেলি ফুলে মিলে আমাদের গ্রামকে সুগন্ধে মাতিয়ে দিক।'

বেলি হাসল। কিন্তু কোন সায় দিল না।

বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হল পরদিন সকাল থেকেই। মায়ের শখ, গ্রাম্য লোকাচার অনুযায়ী মেয়ে-জামাইকে বসিয়ে হলুদ মাখাবে, গীত গাওয়াবে, ক্ষীর খাওয়াবে।

সুতরাং আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হল। সবার আগে রূপের ডালি নিয়ে চামেলি এল। সঙ্গে কত উপহার আনল বর-কনের জন্য। মামারা এল, খালারা এল। বড় দুঃখের মাঝে যেন বড় আনন্দের বিয়ে।

সকাল ভর কেনা-কাটা চলল। বর-কনেকে হলুদ মাখানো হল। পর্দা তো নেই, পরন্তু দ্বীনদারীতে বিদআত পরিপূর্ণ। সুতরাং কোন কিছুতে বাধা থাকার কথা নয়।

সন্ধ্যা হল, গ্রামের মেয়েরা এল। বর-কনে সাজল বিয়ের সাজে। কনের সাজে বড় সুন্দরী দেখাচ্ছিল বেলি। দু'জনকে একই আসনে বসানো হল। গীত শুরু হল। খুশীতে মেতে উঠল বেলির ঘর। অনেকে ক্ষীর খাওয়াতে এসে উপহারও দিল।

আজ রবিবার। বিয়ের দিন হয়েছে মঙ্গলবার। রাত্রে বকুল নফুরা চাচীর কোঠায় ঘুমায়। সকালে বেলির বাড়িতে গিয়ে হবু বউ ও শালীদের সাথে কত আনন্দ করে। এ যেন এক স্বপ্নের জগৎ পেল সে।

সোমবার দিন অতিবাহিত হল। বিকালে বেড়াতে বের হল বকুল। সঙ্গে ছিল পাড়ারই ছেলে রফিকুল। ডাঙ্গা দিয়ে যেতে যেতে গল্প হচ্ছিল। রফিকুল তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে নামায তো পড়ছেন, কিন্তু মসজিদে আসেন না কেন?'

বকুল হেসে বলল, 'একে তো লজ্জা লাগছে। তাছাড়া গ্রামের অধিকাংশ লোক বোধ হয় ওয়াহাবী। আর আমাদের হুজুর বলেন, কোন ওয়াহাবীর পিছনে নামায হবে না।'

---ওয়াহাবীরা কাফের, তাই না?

---তা জানি না। তবে শুনেছি, তারা নাকি নবী ও আওলিয়াদেরকে সম্মান দেয় না। আপনি আবার ওয়াহাবী, আপনি কিছু মনে করছেন না তো?

---না-না, ঠিক আছে। আপনার দোষ কী? দোষ তো তাদের, যারা না জেনে ফতোয়াবাজি করে। আসলে ওয়াহাবীরা যাঁর যেমন সম্মান, তাঁকে তেমন সম্মান দেয়। সম্মান দেওয়াতে বাড়াবাড়ি করে না। পক্ষান্তরে আওলিয়াদের ঠিকেদাররা বাড়াবাড়ি ক'রে আল্লাহর সম্মান ক্ষুণ্ন করে। যাকগে, মসজিদে আসেন, না আসেন আপনার ব্যাপার। আসলে সামাজিকতাও একটা বড় জিনিস। শিক্ষিতদের সে খেয়াল রাখা উচিত।

---ঠিক আছে। কাল থেকে আসব।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। গত রাতের চাইতে আজকের রাতে বেশি ধুমধাম শুরু হল। আনন্দে মাতল চামেলি। বেলির চোখে-মুখে আনন্দ ছিল, কিন্তু ভিতরে ছিল ঝড়-তুফান। আর বকুলের আনন্দেও ছিল আবীলতা, বিবাহের পর কর্তব্যের দুশ্চিন্তা।

(১০)

আজ বকুল-বেলির বিয়ে। ফুলে-ফুলে মিলনের শুভদিন। বকুলের সুপ্রভাত ছিল। তবে তখনও সে ঘুমিয়ে ছিল চাচীর বাড়িতে। হঠাৎ কিসের হৈ-চৈ-এ তার সুনিদ্রা ভাঙ্গল। কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগল, কিসের জন্য এত কলরব। হয়তো বা রান্নাবান্নার জন্য। তা ঠিক নয়। বেলির মা যেন কাঁদছে। চামেলি মা-কে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তাহলে মায়ের কি কোন অসুখ হল?

চাচী যেন 'ছিঃ-ছিঃ' করছে। আরো মহিলারা কানাকানি করছে।

ব্যাপারটা কী?

বকুল উঠে কোঠা থেকে গলা ঝেড়ে নিচে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে চাচী!'

চাচী শাক দিয়ে মাছ ঢেকে বলল, 'কিছু হয়নি, মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবে। তাই মা কাঁদছে।'

বকুল আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ওতো এখন যাবে না, তাহলে এখন থেকে কাঁদছে কেন?'

---যাবে তো একদিন বাবা!

চাচী ভেবেছিল বেলি কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবে। সাত সকালে সে মাকে বলেছিল, 'মা আমার পেটে খুব যন্ত্রণা। আমাকে হাসপাতাল যেতে হবে ওষুধ আনতে।'

মা মানা করেছিল, কিন্তু পেটে হাত বুলিয়ে কান্না দেখে 'সঙ্গে কাউকে নিয়ে যা, তাড়াতাড়ি চলে আসবি' বলে অনুমতি দিয়েছিল। দুই কিলোমিটার দূরে পাশের গ্রামের হাসপাতাল। তার ফিরতে এত দেরি হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ব্যাপার কী? যন্ত্রণা বেশি বেড়ে যায়নি তো?

একজনকে সাইকেল নিয়ে পাঠানো হল খোঁজ নিতে। যেতে যেতে মাঝ পথে শেফালীর সাথে দেখা।

---তুমি বেলিকে দেখোনি?

---হ্যাঁ। আমরা দোকানে বসে মিষ্টি খেলাম। তারপর আমাকে বলল, 'আমার পেটের ব্যথা এখানে ভাল হবে না। আমি বর্ধমান যাব। তুমি ঘর চলে যাও।' তাই আমি চলে এলাম। আর ও মেমারী এক্সপ্রেস চেপে চলে গেল।

বাড়ি ও গ্রামের অনেকে শেফালীর কথা বিশ্বাস করল, অনেকে করল না। এইভাবে একাকিনী কেউ বর্ধমানের হাসপাতাল যেতে পারে না। তাছাড়া আজই তার বিয়ে। গ্রামের লোক অপেক্ষায় আছে, যোহরের পর তার বিয়ে পড়ানো হবে। এ তো আজব কর্মকাণ্ড!

বিয়ের কনে বর্ধমান হাসপাতালে! দুর্বার গতিতে খবর ছড়িয়ে গেল। অবশ্য বকুলের কাছে সে খবর পৌঁছতে দেওয়া হল না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। বকুল খাওয়া-দাওয়া সারল। এবার তো তাকে কিছু বলতে হবে। রফিকুল এসে বলল, 'বকুল ভাই! বিয়েটা রাত্রে পড়ানো হবে। দুপুরে একটু অসুবিধা আছে আমাদের।'

বর তো ঘরের ভিতরেই। তার সাথে কোন বরযাত্রী নেই, বদযাত্রীও নেই। বরকে বাড়ি ফিরে যেতেও হবে না। অতএব তাতে অসম্মতির কী আছে? সাদা মনের বকুল নামায পড়ে আবার বিশ্রাম নিতে কোঠায় উঠে গেল।

কিন্তু আবার সেই কানাঘুসা। ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলে মেয়েরা। কী ব্যাপার? চামেলীকে দেখা যায়, বেলিকে দেখা যায় না কেন? হয়তো-বা আজকের বাসর রাতে সারপ্রাইজ আছে।

বিকেলের সমস্ত বাস বর্ধমান থেকে ফিরে এল। কৈ? বেলি এলো না। বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা ক'রে নিরাশ মনে ফিরে এল রফিকুল। সেও ঘটনার প্রকৃতত্ত্ব বুঝে উঠতে পারল না।

বর্ধমান তো আর কাছে নয় যে, কাউকে সাইকেল নিয়ে দেখা করাবে। পরদিন সকালের ফার্স্ট্‌ এক্সপ্রেস ছাড়া তো উপায় নেই। হয়তো-বা সে হাসপাতালে ভরতি হয়ে গেছে। কিন্তু এত বড় রোগে সে বাড়ির কাউকে সঙ্গে না নিয়ে একা ভরতি হতে গেল?

এ কথা অনেকেই মানল না। বকুলকে পরিশেষে তাই বুঝাতে হল। কিন্তু তার হৃদয় বেলির প্রেমে টইটম্বুর। সে তো কাঁদতে শুরু ক'রে দিল। 'সকাল থেকে আমাকে বলা হল না কেন? সাথে আব্বা গেল না কেন? জানি না এখন সে কোথায় আছে, কেমন আছে?'

রাত্রে আর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হল না। গতরাত্রে যে বাড়ি বিয়ের আনন্দে মাতোয়ারা ছিল, আজ সেই বাড়িতেই যেন মরা-বাড়ির শোকছায়া।

কথোপকথন ও জাগরণের সাথে সুদীর্ঘ রাত্রির সকাল হল। বকুল যেতে চাইল বর্ধমান। বেলির আব্বা নিষেধ ক'রে বলল, 'আমিই দেখে আসি।'

বিকালে নিরাশ হয়ে ফিরে এল আব্বা। বেলির খবর পেল না বর্ধমান মেডিকেল কলেজ তথা হাসপাতালে। একজন পরিচিত লোক ভরতি আছে, তাদের আত্মীয়রাও বলল, 'এখানে বেলি আসেনি।'

তাহলে সে গেল কোথায়? বকুল কাঁদতে লাগল। সে কান্না কোন পুরুষের কান্না নয়, সে যেন কোন মহিলার কান্না।

ওদিকে বেলির মা-বাপ ও বোন চামেলি কাঁদল। মামা ও জামাই না কাঁদলেও বড় মর্মাহত তারা। পেটের যন্ত্রণায় কোথাও মারা গেল কি না?

আবার সামনে রাত্রি এসে উপস্থিত হল। সবারই কান্না থামলেও বকুলের আকুল কান্না তখনও তার চোখের দু'কুল ভাসিয়ে চলছিল। চামেলী এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তার স্বামী, মামা, বাপ-মা সবাই তাকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল, চাচী কত সাহস ও আশা দিয়ে বলল, 'সে ঠিক ফিরে আসবে।' কিন্তু বকুলের মন বলে, 'সে হয়তো তাকে একা ফেলে চলে গেল।' দমকা হাওয়া লেগে শিষ-ওয়ালা ধানের যে অবস্থা হয়, বকুলের অবস্থা তার থেকে কম ছিল না।

রফিকুল এল খবর নিতে। চামেলি তাকে বলল, 'একটু বুঝাও না ভাই!'

কিন্তু শোকাতুর বকুল বুঝলেই তো। মুখে কিছু না বললেও তার দুই চোখ বেয়ে যে প্রবহমান ঝরনা ছিল, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আসলেই সে তার প্রেমের ডালিখানি উজাড় ক'রে দিয়েছিল বেলির জন্য। তা না হলে শ্বশুর বাড়িতে ক্ষীর খেয়ে আবার কেউ বিয়ে করতে আসে?

ক্ষণেক পরে চাচী বলল, 'আমার মন বলছে, সে কলকাতা চলে গেছে। হুজুর এমন পানিপড়া দেন, তাতে সঙ্গে সঙ্গে পেটের ব্যথা চলে যায়। মনে হয়, সেই পানিপড়া নিতেই সে সেখানে গেছে। আর ওখানে গেলে তো কোন চিন্তা নেই। তাঁরা ঠিক পাঠিয়ে দেবেন।'

তবুও বেলির মা বলল, 'কলকাতায় গিয়ে না হয় একবার দেখে আসা যাক।'

কিন্তু যাবে কে? বেলির আব্বা কলকাতা দেখেইনি। অন্য কেউ কাজের ওজরে যেতে চাইল না। দায়িত্ব পড়ল রফিকুলের ঘাড়ে। সে কলকাতা জানে, হুজুরদের বাড়িও জানে। বেলির মা তার হাত দু'টিকে ধরে কেঁদে কেঁদে বলল, 'বাবা! তুমিই একবার হুজুরদের বাড়ি গিয়ে দেখে এস। সেখানে থাকলে সঙ্গে নিয়ে এস। না গিয়ে থাকলে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি ঠিক বলে দেবেন, মেয়ে আমার কোথায় আছে।'

রফিকুল বলল, 'কোথায় আছে তিনি কী ক'রে জানবেন।'

---হ্যাঁ বাবা! তাঁদেরকে সব মালুম আছে।

অর্থাৎ, তাঁরা গায়বের খবর জানেন। তাঁরা আসমান-জমীনের সমস্ত খবর বলতে পারেন। কেউ কেউ বলে, তাদের বুকে টেলিভিশন ফিট করা আছে!

আজ একটা পরীক্ষার সুযোগ পেল রফিকুল। মনে মনে বলল, দেখব, তাদের টেলিভিশনের কত পাওয়ার। কৌতূহলের সাথে আরো

বেশী ক'রে তাদের আকুতি-মিনতিতে রাযী হয়ে গেল সে।

সকালে বিশ্বভারতী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ধরার কোন বাস নেই। সাইকেলে ক'রে বেলির বাপ স্টেশনে নিয়ে গেল। কিন্তু তাদের স্টেশন ঢোকার আগেই বিশ্বভারতী পার হয়ে গেল।

এবার উপায় কী? স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, রাতের কোন লোকাল লেটে আসছে, বর্ধমান পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

বর্ধমান থেকে ইলেক্ট্রিক ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌঁছল রফিকুল। সরাসরি হুজুরদের বাড়ি গেল। দরজায় আঘাত করতেই কাচ বসানো সরু ছিদ্র দিয়ে দেখে একজন খাদিম দরজা খুলে নাম-ঠিকানা জানতে চাইল। সব কিছু বলে জিজ্ঞাসা করল, 'হুজুর কোথায়?'

খাদিম বলল, 'ঐ সামনের রুমে আছেন। কী দরকার বল?'

রফিকুল বলল, 'ব্যক্তিগত দরকার আছে, একটু বাইরে আসতে বলুন।'

হুজুর বিনয়ী মানুষ। বাইরে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার, কী দরকার তোমার?'

রফিকুল বলল, 'বেলি নামের এক মেয়ে আপনার এখানে থাকত। তার দু'দিন আগে বিয়ে ছিল। কিন্তু বিয়ের দিন সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। সে এখানে এসেছে কি না, তা জানার জন্য তার মা-বাপ আপনার কাছে পাঠাল।'

হুজুর অবাক হয়ে বললেন, 'না না। সে এখানে আসেনি তো!'

রফিকুল বলল, 'তাহলে দয়া ক'রে আপনি বলে দিন, সে কোথায় আছে? তার মা-বাপ এ কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে।'

---বলোগে, দেশেই আছে দেশে।

তারপর তিনি তাঁর অমূল্য সময় আর নষ্ট না ক'রে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

রফিকুল হতাশ হয়ে গেল। তাঁর টেলিভিশনে ধরা পড়লে কি তিনি না বলতেন, 'অমুক জায়গায় আছে।' দেশেই আছে---এ কথা তো সবাই জানে। কলকাতায় আসেনি, তখন দেশেই থাকবে। কিন্তু সেই সুদূর প্রসারী দেশের কোন্ গ্রাম বা শহরে আছে, তা খুঁজতে তো কোন টেলিভিশনই পারবে না।

আসলে অন্ধ ভক্তরা তাঁদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। আর তাঁরাও দু-একটা খবর আন্দাজে আমভাবে এমন ক'রে বলেন যে, অজ্ঞরা মনে করে, তাঁরা গায়বের খবর জানেন। আর তাঁরাও নিজেদের বুযুর্গি বহাল রাখার জন্য ভক্তদেরকে এ কথা শিখিয়ে দেন না যে, আসমান-জমীনে আল্লাহ ছাড়া গায়বের খবর অন্য কেউ জানে না, এমনকি নবীও না।

রফিকুলের সেই ধারণাই ছিল। সরে-জমীনে পরীক্ষা হয়ে গেল। এবারে সে ফিরে গেল রিপন স্ট্রীটে নফুরার ভায়ের বাসায়, যদি সেখানে থাকে। কিন্তু না, সেখানেও নেই।

ঘটনা শুনে নফুরার ভাবী বলল, 'তার আবার দ্বিতীয় প্রেমিক নেই তো?'

চাচীর ভাবী বেলিকে চিনত। বকুল-বেলির প্রেমের খবরও জানত। অতএব বিয়ের দিনে যে মেয়ে ঐভাবে গায়েব হতে পারে, সে মেয়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রেমিকও থাকতে পারে। অসম্ভব কী?

সেখান হতে বিদায় নিয়ে তাড়াহুড়া ক'রে বিশ্বভারতী ধরতে ছুটল রফিকুল। হাওড়া ব্রিজ থেকে বহু দূরে থেকেই রোড জ্যাম। রফিকুল বুদ্ধি ক'রে ট্রাম থেকে নেমে গঙ্গায় স্টিমার যোগে ওপারে স্টেশনের

ধারে পৌঁছল। টিকিট কেটে আসতে আর একটু দেরি হলে ট্রেনটি ফেল হয়ে যেত।

ট্রেনে বসে রফিকুল সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল। সে বেলিকে কুরআন পড়িয়েছে। সে তো কিছুই জানে না। অবশ্য এই শ্রেণীর গোপন খবর সেই জানবেই-বা কীভাবে?

স্টেশনে নামল রফিকুল। নেমে দেখল, গ্রামে ফিরার কোন বাস নেই। পাশের গ্রামের এক ভদ্রলোকের সাথ ধরে ভাবল, কোন ট্রাক-ফ্রাক পেলে ধরে নেবে। স্ট্যাণ্ডে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও কিছু না পেলে ভদ্রলোকটি বললেন, 'চল, হাঁটতে লাগি।'

---কিন্তু আপনি তো আগেই আপনার গ্রামে ঢুকে যাবেন, আর আমি কী করব?

---ঐটুকু তুমি চলে যাবে।

দুই গ্রামের মাঝে ছোট জঙ্গল আছে। রফিকুল মনে মনে বলল, 'আমার বাপের তাকত নেই, জঙ্গল পার হয়ে আমি আমার গ্রামে ফিরব। মাঝে মাঝে গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে পথ অবরোধ ক'রে গাড়ি ছিন্তাই করে ডাকাতরা। এমনিতেই একা পেলে কাছে যা থাকে তা কেড়ে নেয়। তাছাড়া আমবাগানের বট গাছে এক প্রেমিকা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। বড় দীঘির দক্ষিণের আমবাগানে প্রেমিক-প্রেমিকা বুকে মাথা রেখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ওরে বাপরে বাপ! আমি একা অন্ধকারে এ সব পার হতে পারি?'

রফিকুল মনে মনে কত কী ভাবে, আর পথ চলে। মাঝে মাঝে সাথীর কথার জবাব দিয়ে শুধু 'হুঁ হুঁ' বলে।

এক সময় সাথীর গ্রাম পৌঁছে গেল। সে চলে গেল। রফিকুল একবার

ভাবল, গ্রামের মুসলিম পাড়ায় মসজিদে গিয়ে শুয়ে যায়। কিন্তু বাস-স্ট্যাণ্ডে আলো দেখতে পেল। ভাবল, যদি তাদের গ্রামের কেউ থাকে।

কাছে এসে দেখল, কিছু যুবক পিকনিক করছে। তাদের কেউ ঐ গ্রামের, কেউ অন্য গ্রামের। রফিকুল তাদের কাউকে চেনে না। কাছে যেতেই একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা বাড়ি?'

ভয় ও লজ্জাজড়িত কণ্ঠে রফিকুল বলল, 'সামনের গ্রামে। আপনারা আমার একটি উপকার করতে পারবেন? আমি এক বিপদে কলকাতা গিয়েছিলাম। বিশ্বভারতী থেকে নেমে বাস না পেয়ে একজনের সাথে হেঁটে এ পর্যন্ত এলাম। আমাকে একটু আমার গ্রাম পর্যন্ত পার ক'রে দিয়ে আসবেন?'

একজন বলল, 'ওবে দেখিস আবার। সেদিনে কাদায় গাড়ি পড়ে গেছে বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছিন্তাই করেছে।'

রফিকুল বলল, 'সে ভয় নেই। আমার বাড়ি ঐ গ্রামেই।'

একজন বলল, 'কার ছেলে তুমি?'

রফিকুল বলল, 'মুহাম্মাদ শেখের।'

সে রফিকুলের আব্বাকে চিনত। এই গ্রামের চালকল মালিকের ছেলে সে। বলল, 'কাজল শেখকে চেন?'

রফিকুল বলল, 'অবশ্যই চিনি।'

বলল, 'তার কয়টা ছেলে বল তো?'

এবারে রফিকুল যেন সমস্যায় পড়ল। হকচকিয়ে বলল, 'তার ছেলে কয়টা তা জানি না। তবে অনেক ছেলে এটা জানি।'

একজন বলল, 'তুমি গ্রামের লোকের কার কয়টা ছেলে চেন না, তাহলে সে গ্রামের লোক কী ক'রে হলে?'

বলল, 'দেখুন, আমি আসলে বাইরে পড়াশোনা করি। গ্রামে তেমন একটা থাকি না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার বাড়ি ঐ গ্রামেই। দরকার হলে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করুন।'

এরপর চালকল মালিকের ছেলে বলল, 'এ চল চল, ঠিকই বলছে। চল ওকে আগিয়ে দিয়ে আসি।'

রফিকুল স্বস্তির শ্বাস নিল। তারা সঙ্গে টর্চ ও লাঠি নিয়ে তাকে তার গ্রামের ধার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

সকালে রফিকুল সব খবর খুলে বললে, কাঁদাকাটির পালা আরো জোরদার হল। বলল, 'বাবা! আর একবার ওর সখীর বাড়িতে খোঁজ নিয়ে এস।'

কী করে রফিকুল? তার মাদ্রাসা কামাই হচ্ছে। কোন কোন লোক তাকে তাদের চক্করে পড়তে মানাও করছে। তার সন্দেহ বাড়ছে, কিন্তু তখনও সে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি।

বেলির এক সখীর বিয়ে হয়েছে মঙ্গলকোটে। সেখানে গেল এবং তার সখীর কাছে কুলের কথা খুলে বুঝতে পেরে রফিকুল বড় লজ্জিত হল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার দ্বিচারিণীর চরিত্র। বুঝতে পারল, সেদিন সে বড় ভাবনা-চিন্তে করেই বাড়ি থেকে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বের হয়েছে।

কুল রাখি না শ্যাম রাখি হায় মনে আমার দ্বন্দ্ব,
কে যে আমায় বাসবে ভাল, কে বাসিবে মন্দ?
বেছে নেওয়ার পাইনি সুযোগ আজ তার শেষ দিন,
শ্যাম রাখতে কুলে কালি, তা-ধিনাধিন ধিন!

রফিকুল গ্রামে ফিরে বেলির খবর না পাওয়ার খবর দিল, কিন্তু তার আসল খবর চাপা রাখল সে।

(১১)

বকুল অপেক্ষায় থাকল। শোকে-তাপে আধখানা হয়ে গেছে সে। বিকাল বেলায় তাকে শাল-বন বেড়াতে নিয়ে গেল রফিকুল। নানা গল্প করতে করতে হঠাৎ রফিকুল বলে উঠল, 'বকুল ভাই! ওয়াহাবীদের ধারণাই তাহলে ঠিক তো?'

---কেন?

---কই আপনাদের পীর সাহেব তো আপনার নিখোঁজ বেলির খবর বলতে পারলেন না।

---তাঁদের অনেক কেরামতি আছে।

---আছে তো, কিন্তু অধিকাংশ 'ঝড়ে কাক মরে, আর ফকীর সাহেবের কেরামতি বাড়ে।' অন্ধ বিশ্বাস মানুষকে শির্কে পতিত করে। তাঁদের কেরামতিতে আপনার চাকরি হবে। এখন যান বেলিকেও চেয়ে নিন তাঁদের কাছে। আপনি না বেলিকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসেন?

---অবশ্যই ভালবাসি। সে যে আমার মনের, সে যে আমার প্রাণের। সে যে আমার বিশ্বাস, সে যে আমার নিঃশ্বাস। সে যে আমার মনের মতন, সে যে আমার হৃদয়-রতন।

---হুঁ! 'মনের মতন রতন পেলে যতন করি তার।' আবার 'যতনে যাতনা বাড়ে তারে কি ভুলিতে পারি?'

---আচ্ছা রফিকুল ভাই! বেলি কি মারা গেল?

---আমি যদি বলি,

'শয়নে স্বপনে মনে যে যারে ধায়,

সেজন তাহারে ফিরে নাহি চায়।'
ঘুরছ তুমি যাহার পিছে আপন করার লাগি,
সে ঘুরছে আরেক জনের ভালবাসা মাগি'।

---না-না, এ আমি বিশ্বাস করি না। সে শুধু আমাকেই ভালবাসে। আমি জানি তার মনের কথা, প্রাণের কথা, চাওয়া-পাওয়ার কথা।

---আমি আপনার চাইতে বয়সে ছোট। আপনি শিক্ষিত ছেলে। তবে আমিও পড়াশোনা করছি। নারীদের ব্যাপারে প্রাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা না থাকলেও বই-পত্র পড়ে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় মানুষকে এত বিশ্বাস করা ভাল নয়। আমি জানি, মানুষকে বিশ্বাস না করলেও কোন শান্তি নেই। কিন্তু অযথা বিশ্বাস করলেও অশান্তি আছে। আর এ কথাও বলছি না যে, শুধু নারীরাই বিশ্বাসঘাতিনী। বিশ্বাসঘাতক পুরুষও আছে।

'--- আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি-
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে একি মিথ্যা অকরুণ খেলা!
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার নারী!
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম, মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।'

বকুল ভাই! আপনি জানেন, 'সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস।' ব্যাপারটা যখন আপনার বুঝে আসবে, তখন আপনিও কবির মতো বলতে বাধ্য হবেন,

'এ তুমি আজ সে---তুমি তো নহ; আজ হেরি তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী?

কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
---প্রাণ নিয়ে এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দ'লে অলক্তক পরে এরা পায়!
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্থন,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি!
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতি লোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহু জন!'

---আরে! আপনি দেখছি নজরুলের সব মুখস্থ রেখেছেন।

---কেন মাদ্রাসার ছাত্র বলে অবজ্ঞা করেন?

---না-না! অবজ্ঞা নয়। আসলে তারা তো আরবী-উর্দু নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আর নিজের ভাষার খোঁজ রাখে না। আচ্ছা আপনিও কি কারো প্রেমে পড়েছেন নাকি?

---প্রেম তো প্রত্যেক মানুষের আছে ভাই। প্রেমে পড়তেও দোষ নেই। দোষ হল অবৈধ পদ্ধতিতে প্রেম প্রকাশ করা। মনের মতো মানুষকে ভাল সকলেই বাসে। ভালবাসা তো মনের ব্যাপার। মনকে কি কেউ বাধা দিতে পারে? আপনার মত প্রেমে না পড়লেও প্রেমের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে অসুবিধা কোথায়? ডিমের রঙ বলতে তো ডিম পাড়া জরুরী নয়। ঐ যে বলে না, 'বিয়ে করিনি, তা বলে কি বরযাত্রীও যায়নি?'

---ঠিকই বলেছেন। তবে অনেক সময় মানুষ প্রেমে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কখন যে বন্যার পানি উপচে পড়ে দু'কুল প্লাবিত ক'রে ফেলে তা নদী নিজেও জানতে পারে না।

---আমি বলি কী, আপনি বাড়ি ফিরে যান। সে মনে হয় অন্যের মনে বন্যা হয়ে ধন্য হয়েছে।

---আমি বিশ্বাস করি না। বেলি শুধু আমার ছিল, আমারই থাকবে।

---মানুষ বর্তমানকে বিশ্বাস করে। আকর্ষকের প্রতি আকৃষ্যমাণ হয়। কিন্তু যখন পাশাপাশি দুই অথবা তিন আকর্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সারিতে এসে এক সাথে আকর্ষণ করে, তখনই মানুষ দ্বন্দ্বে পড়ে। বিচার করতে ধন্দে পড়ে। আমার মনে হয় আপনার বেলিরও তাই হয়েছে।

---আমার চাইতে বেশি আকর্ষণ অন্য কেউ করতে পারে না।

---তা কী ভাবে জানলেন? আপনি দেখছি, দ্বিতীয় নম্বর ইমরুল কাইস মজনূ। এই দেখেন, মজনূর কথা বলতে গিয়ে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। কোন এক বইয়ে পড়েছিলাম। এক দরবেশ লায়লীর প্রেম বর্জন করতে উপদেশ দিয়ে গল্পটি মজনূকে বলেছিল।

ঈসা নবীর যুগের কথা; যে নবী আল্লাহর ইচ্ছায় মুর্দাকে জিন্দা করতে পারতেন। এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা বিবাহ বন্ধনে সমর্থ হয়। এক ছোট্ট গ্রামে তাদের প্রেমের বাসা ছিল। তাতে ছিল তাদের ভালবাসার সাজানো বাগান। সে বাগানে প্রণয়ের কত রঙ-বেরঙের কুসুম ছিল। পীরিতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল তাদের সেই ফোটা ফুল।

এক রাতে প্রেমালাপে মগ্ন ছিল সেই প্রেমময় দম্পতি। তারা যেন একটি ছোলার দু'টি বিউলি। একটি ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ। দু'টি দেহ, একটি মন, একটি প্রাণ।

হঠাৎ স্বামী বলল, 'প্রিয়তমে! আমি মারা গেলে তুমি কি অন্য কাউকে বিয়ে করবে?'

স্ত্রী বলল, 'এমন কথা কেন বলছেন প্রিয়ে! আল্লাহ যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমিই যেন আপনার আগে মরতে পারি। আর অন্য পুরুষ? আমি অন্য পুরুষের দিকে তাকিয়েও দেখব না। তাছাড়া মেয়েদের বিয়ে করা তত কি সহজ, যেমন ছেলেদের সহজ? আমি মারা গেলে আপনিই হয়তো অন্য মেয়ে গ্রহণ করবেন।

---কোন দিন না। চিরদিন আমি তোমার, আর তোমার। অন্য কেউ তোমার এ জীবন তরীতে আসতে পারে না। আল্লাহ না করুক---তুমি আমার আগে মারা গেলে আমি তোমার কবরের পাশে ঘর বানিয়ে তোমাকে স্মরণ ক'রে জীবন কাটিয়ে দেব।

---আমিও তাই। আমি আপনার কবরের খিদমত ক'রে জীবন কাটিয়ে দেব।

ভালবাসার সুদৃঢ় বন্ধনে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন এল পরীক্ষার দিন। ভালবাসার অগ্নিপরীক্ষা। কোনও কারণে স্ত্রী মারা গেল। রয়ে গেল প্রেমিক স্বামী একাকী।

ওয়াদা মতো স্ত্রীর কবরের পাশে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে শুরু করল। কবরের চারিপাশে ফুলগাছ লাগিয়ে মনোরম প্রেমের পরিবেশ তৈরী ক'রে স্ত্রীর কবর জড়িয়ে ধরে ভালবাসার পরশ কল্পনা করতে থাকল।

তার সে প্রেম ছিল সত্যই খাঁটি প্রেম। বকুল ভাইয়ের মত ব্যাকুল মনের প্রেম। দিন যায় মাস ফুরায়।

একদিন সেই কবরের পাশ বেয়ে ঈসা নবীর আগমন ঘটে। তিনি যুবকের কাণ্ড দেখে বিস্মিত হন। তিনি তাকে কবরের পাশে এভাবে

বাস করতে নিষেধ করেন। কবরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে প্রেম প্রকাশ করতে বারণ করেন। তিনি তার কাহিনী ও এভাবে বাস করার কারণও শোনেন। যুবক তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে এবং তিনি পরিচয় দিলে সে তাঁর পা দু'টি জড়িয়ে ধরে আবেদন ক'রে বলে, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিন।'

নবী বললেন, 'জীবন-মরণ তো আল্লাহ কাছে বাবা!'

---আমি জানি আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করলে আমার স্ত্রী প্রাণ ফিরে পাবে। আপনি তাকে বাঁচিয়ে দেন আল্লাহর নবী! তা না হলে আমার জীবন এই ভাবেই কাটবে।

ঈসা নবী আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। আল্লাহর নিকট থেকে অহী এল, 'যে মারা গেছে, তার হায়াত ছিল না বলেই মারা গেছে। এখন কেউ যদি তাকে হায়াত ধার দেয়, তাহলে সে জীবন ফিরে পাবে।'

এ কথা শুনে চট্ ক'রে যুবক বলল, 'আল্লাহর নবী! আমি তাকে আমার অর্ধেক হায়াত দান করব।'

---তাহলে তো তোমার হায়াত কমে যাবে এবং দুজনের একই সাথে মরণ হবে।

---সেটা তো খুবই ভাল। আপনি দুআ করুন। আমি আমার অর্ধেক হায়াত দিয়ে দিলাম।

কবরের মাটি সরানো হল। ঈসা নবী দুআ করলেন। অমনি ঘুমন্ত ব্যক্তির হঠাৎ জেগে ওঠার মত যুবতী কবরে উঠে বসল!

ঈসা নবী চলে গেলেন। স্ত্রীকে তুলে নিয়ে তাঁবুতে তুলে আল্লাহর লাখ শুকরিয়া জ্ঞাপন করল যুবক। হায়াত দান করার কথা স্ত্রীকে গোপন করল। স্ত্রীকে বলল, 'চল, আমরা এ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে

যাই। নচেৎ মানুষের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হব।

স্বামী-স্ত্রী কোন দূরবর্তী এলাকায় এক জঙ্গলে এক নদীর ধারে ছোট্ট একটি বাসা বানিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। সেই প্রেম, সেই ভালবাসা, সেই সংসার, সেই আশা।

স্বামী প্রায় অর্ধেক দিন জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করে, অর্ধেক দিন দূরবর্তী শহরে গিয়ে বিক্রি ক'রে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে আনে। মোটা খাবার, মোটা কাপড়---এতেই খোশ ছিল যুবতী। কিন্তু কতদিন?

মানুষের মন পরিবর্তনশীল। শূন্য ময়দানে পড়ে থাকা হাল্কা তুলোর মত অস্থির। সামান্য ফুসমন্তরে পাল্টে যায় মনের গতি, প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয় লোভী মানুষের মন। ধীরে ধীরে এক ঘেয়েমি যুবতীকে গোপনে তিক্ত ক'রে তুলতে লাগল।

এক রাতে বৃষ্টি হল। বৃষ্টির পানি ঘরের ভিতরে এলে ঘুম বরবাদ হল। ভাল ঘর, ভাল বাসস্থানের বাসনা মনে জেগে উঠল। কে না চায় তা?

সকালে রোজকার মত স্বামী কাঠ সংগ্রহ করতে বের হয়ে গেল। সে দুপুরের আগে কুঁড়ে ঘরের সামনে একমনে গুন্‌গুন্ ক'রে গান করছিল। সুন্দরী যুবতী। চোখে-মুখে চাপল্যের ছাপ। হঠাৎ সে দেশের রাজপুত্র ঘোড়ার লাগাম টেনে থমকে দাঁড়াল। সে এসেছিল হরিণ শিকার করতে। হরিণের পিছে ছুটতে ছুটতে যুবতীর কাছে এসে পৌঁছে গিয়েছিল।

সুকন্যার দুরবস্থা দেখে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে সুন্দরী! এখানে তুমি কার সাথে বাস কর?'

সুসজ্জিত সুদর্শন একজন যুবকের প্রতি তাকিয়ে নিমেষে যুবতী মুগ্ধ হয়ে গেল। কোন কথাটি ভাবল না। উত্তরে সে বলল, 'কারো সাথে না।'

রাজপুত্রের মনেও চমক ধরিয়েছে যুবতী। তার এই অসহায় অবস্থা

দেখে বলল, 'তুমি কি যাবে আমার সাথে?'

---কোথায়?

---আমার রাজপুরীতে। তোমাকে রাজরানী ক'রে দেব। সুন্দরীকে বেহেশ্তী হুরী বানিয়ে দেব।

যুবতী ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিল। রাজপুত্র তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রাজদরবারে ফিরে এল। যুবতীকে দাসীদের হাওয়ালা ক'রে দিয়ে তাকে সুসজ্জিতা করার আদেশ দিল।

কুঁড়ে ঘরের দাসী আজ রাজরানী। রাজকীয় পোষাক, রাজকীয় খাবার, রাজকীয় থাকার-শোবার কক্ষ, এ যেন সাক্ষাৎ বেহেশ্ত। অতীত ভুলে গেল যুবতী।

রাজার কাছে খবর গেল। রাজপুত্র বন থেকে এক সুকন্যা কুড়িয়ে এনেছে, সে তাকে রাজবধূ বানাতে চায়। দোষ কী তাতে?

এদিকে যুবক সন্ধ্যার সময় খাবার সাথে ঘরে ফিরে দেখে স্ত্রী নেই। যে স্ত্রী ঘরে ফিরতেই সাদরে বসতে দিত। হাতের তৈরী পাখা দিয়ে বাতাস ক'রে দিত। সযত্নে খেতে দিত। কোথায় সে?

বহু খোঁজাখুঁজি ক'রেও না পেয়ে নিরাশ হয়ে জেগে জেগে দুশ্চিন্তার সাথে রাত কাটাল। সকালের উজ্জ্বল আলোতে দেখতে পেল, তার কুঁড়ে ঘরের সামনে ঘোড়ার পাঁজ রয়েছে। সন্দেহ হল, কোন ঘোড়-সওয়ার শিকারী হয়তো তার স্ত্রীকে অপহরণ ক'রে তুলে নিয়ে গেছে।

বেরিয়ে পড়ল শহরের দিকে। ঘোড়ার পদচিহ্ন মানে রাজা অথবা রাজার কেউ হতে পারে। এই সন্দেহে সে রাজদরবারের আশেপাশে খোঁজ নিল। কারো নিকট থেকে সে খবর পেল, সত্যিই রাজপুত্র জঙ্গল থেকে এক বনকন্যা কুড়িয়ে এনেছে।

রাজদরবারে গিয়ে যথানিয়মে রাজার কাছে নালিশ করল, 'মহামান্যের পুত্র আমার স্ত্রীকে আমার ঘর থেকে অপহরণ ক'রে এনেছে।'

---আমার পুত্র তোমার স্ত্রীকে অপহরণ করেছে?

---আজ্ঞে হ্যাঁ।

---সে হয়তো তোমার স্ত্রী নয়। সে অন্য কোন মেয়ে।

---না-না, দেখলে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারব।

যুবতীকে সামনে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি কি এই লোকটাকে চেন?'

যুবতী এক ঝলক তাকিয়েই বলল, 'না।'

---লোকটি দাবী করে, তুমি নাকি ওর স্ত্রী?

---আমার জীবনে বিয়েই হয়নি।

যুবক কাঁদতে লাগল। কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বলল, 'ওই আমার স্ত্রী মহারাজ! ওর হয়তো মাথা খারাপ হয়েছে। ওকে জাদু করা হয়েছে। ওকে কিছু খাওয়ানো হয়েছে। ওকে ভয় দেখানো হয়েছে। তাই হয়তো আমাদের সম্পর্ক অস্বীকার করছে।'

কিন্তু রাজপুত্র জানে, এ সবের কিছুই নয়। সুতরাং সে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে জেলে বন্দী ক'রে রাখতে আদেশ দিল।

যুবক কেঁদে কেঁদে আর্জি জানাল, 'মহারাজ! আমরা যে স্বামী-স্ত্রী, তার একটা প্রমাণ আছে।'

---কী প্রমাণ?

---আল্লাহর নবী ঈসা জানেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী।

---আল্লাহর নবী? আর যদি কথা সত্য না হয়?

---আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। ফাঁসি দেবেন আমার। আমি আর

বাঁচতে চাইব না।

কারাগারে বন্দী থাকল একনিষ্ঠ প্রেমিক। বাদশা কিছু লোক পাঠিয়ে দিলেন ঈসা নবীর কাছে। কিন্তু তিনি কোথায় তা জানা গেল না।

এদিকে রাজপুত্রের বিয়ের জন্য তাড়া। তার ইচ্ছা এমন মিথ্যাবাদীর ফাঁসি হওয়াই উচিত, যে রাজপুত্রের ভালবাসাকে নিজের স্ত্রী বলে দাবী করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

হঠাৎ একদিন ঈসা নবী এসে উপস্থিত। রাজদরবার ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সভা বসল, রাজসভা, বিচার-সভা।

রাজ-সিংহাসনে বসানো হল আল্লাহর নবীকে। কাঠগড়ায় উপস্থিত করা হল যুবককে। অন্য দিকে হাজির করা হল যুবতীকে ও রাজপুত্রকে।

জানা সত্ত্বেও ঈসা নবী যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে যুবক! ওই যুবতী তোমার কে হয়?'

---আজ্ঞে! আমার স্ত্রী হুজুর। আর সে কথা হুজুরের জানা আছে।

যুবতীকে প্রশ্ন করলেন, 'ওই লোকটিকে তুমি চেন না, জান না?'

---জী না।

---তুমি কোথায় ছিলে, সেখানে কে তোমাকে আনল?

---সেখানে আমি একা ছিলাম। আমার কেউ নেই হুজুর!

এবারে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সেখানে কোন ঘর-বাড়ি দেখেছিলে?'

---জী হ্যাঁ। একটা কুঁড়ে ঘর ছিল। তারই সামনে ও বসেছিল। ওই বলল, তার কেউ নেই। ও এখানে একা থাকে। তারপর আমি আসতে বললে ও আমার সাথে চলে আসে।

যুবক বলল, 'সব মিথ্যা বলছে হুজুর। রাজরানী হবার আশায় ও মিথ্যা বলছে অথবা ওকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

এতে স্পষ্ট অপবাদ রয়েছে জেনে রাজপুত্র ক্ষুব্ধ হল। আল্লাহর নবী প্রকৃতিস্থ হতে আদেশ ক'রে পুনরায় যুবতীকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ওই লোকটাকে আদৌ চেন না, কখনও দেখনি?'

মাথা নামিয়েই যুবতী বলল, 'জী না।'

---বেশ সে যাক। তুমি চেন অথবা না চেন, তুমি কি ওর নিকটে কোনদিন কোনকিছু ধার বা দান নিয়েছ?

---ধার? দান? না তো। ওর কাছে কী ধার করতে যাব?

---কোন কিছু। আচ্ছা যদি কোন কিছু দান নিয়ে থাক, তাহলে কি ওকে ফেরৎ দেবে?

---অবশ্যই দেব।

---তাহলে বল, আমি যদি ওর নিকট থেকে কোন কিছু দান বা ধার নিয়েছি, তাহলে তা ফেরৎ দিচ্ছি।

যুবতী চট্ ক'রে বলল, 'আমি যদি ওর নিকট থেকে কোন কিছু দান বা ধার নিয়েছি, তাহলে তা ফেরৎ দিচ্ছি।'

যেই বলা শেষ হল, সেই সে কার্পেটের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সভার মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। বাঁদী-দাসী 'হায়-হায়' করতে করতে ছুটে এসে যুবতীকে তুলে নিয়ে গেল। সকলেই অবাক-হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আল্লাহর নবীর দিকে ফ্যালফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল।

রহস্য জানার জন্য সবারই একই প্রশ্ন, 'ব্যাপার কী হুজুর?'

নবী বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক নারী।'

তারপর ঘটনা খুলে বললে সকলে বুঝল লোভের প্রতিফল।

এক মনে বকুল গল্পটি শুনে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আপনি কি মনে করেন বেলি সেই রকমই একটি বিশ্বাসঘাতক যুবতী?'

---অসম্ভব কী?

---আমার মনে হয় না।

---আপনার মন প্রেমিকের, আপনার মন অন্ধ প্রেমের, তাই বিপরীত কিছু মনে হয় না। কিন্তু যদি সত্যিই হয়, তাহলে কী করবেন?

---আমি মরব, আত্মহত্যা করব। এ জীবনই আর রাখব না।

---এটিও একটি অতিরঞ্জিত কথা, অতিরঞ্জিত ভুল কাজ। প্রেমে বিফল হয়ে আত্মহত্যা কেন করবেন? আত্মহত্যা কি আরও বেশি বিফলতা নয়? আপনি শিক্ষিত ছেলে, পূর্ণ না হলেও দ্বীন কিছু তো আছে। আত্মহত্যা মহাপাপ তা আপনি অবশ্যই জানবেন।

"যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান ক'রে যাতনা ভোগ করবে। যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।"

সুতরাং কেন নিজেকে দুনিয়া-আখেরাতে কষ্ট দেবেন? তার চাইতে কি এটা ভাল নয় যে, সে যেমন অন্য মজনূ পেয়ে মজে গিয়ে পলায়ন করেছে, আপনিও তেমনি অন্য লায়লী জুটিয়ে ফেলুন। যে আপনাকে চায় না, তাকে আপনি চাইবেন কেন?

বকুল একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,

'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে,
এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে।'

এমন সময় গ্রাম হতে মাগরেবের আযান ভেসে এল। উঠে ফিরতে চাইল মসজিদে। বকুল বাধা দিয়ে বলল, 'আজ আমরা এখানেই নামায পড়ব।'

নামায শেষে আরও কিছু গল্প হল। বকুল সিদ্ধান্ত নিল, কাল সকালে সে বাড়ি ফিরে যাবে। করলও তাই। বেলির খবর জানিয়ে চিঠি দিতে অনুরোধ ক'রে সকলের কাছ থেকে চোখের পানি মুছতে মুছতে বিদায় নিল।

(১২)

হঠাৎ পুলিশ এল মুকুলের বাড়িতে। মুকুল তখন নতুন বউ নিয়ে প্রেমকেলিতে উন্মত্ত। থানায় তুলে আনা হল নব পরিণীত বর-কনেকে। মুকুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, সে তার প্রেমিকাকে প্রলুব্ধ ক'রে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে।

মুকুল বলল, 'সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। বালাউন্নিসার সাথে তার বহু দিন আগে থেকে ভালবাসা ছিল। তাছাড়া বর্তমানে সে নাবালিকা নয়। তারপর আমি তাকে বাড়ি হতে তুলে আনতে যাইনি। সে নিজে থেকেই আমার বাড়িতে পালিয়ে এসেছে। তার অভিভাবক জোরপূর্বক অন্য ছেলের সাথে বিবাহ দিতে চেয়েছিল, যাকে সে পছন্দ করে না।'

বালাউন্নিসাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, 'হ্যাঁ স্যার! আমি

স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে বোলপুর কোর্টে মুকুলকে আইন মোতাবিক বিয়ে করেছি।'

---এখন আপনার বাবা ও মামা আপনাকে ফেরৎ নিতে এসেছেন, তাদেরকে আপনি কী বলবেন?

---বলুন, আমি আমার স্বামীর সাথে সংসার করতে চাই। আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই না।

বালাউন্নিসার মামা জানত, ছেলেটি লম্পট। বোলপুরের এক কাপড়ের দোকানে চাকরি করে। কিন্তু সে মেয়েকে বুঝিয়েছে যে, দোকানটা তারই। হয়তো সেই লোভে সে বকুলের চাইতে মুকুলকে তুলনামূলক বেশি উপযুক্ত ভেবে বিয়ের দিনে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে পালিয়ে এসেছে। এখন সে কথা পুলিশকে বুঝায় কী ভাবে? কোর্টে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোন কারণবশতঃ রেজিস্ট্রি যে হয়নি, তাও প্রমাণ করা যায় কী ভাবে। থানা থেকে পরামর্শ পেল, উকীল ধরে অথবা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা ভাল। কারণ, আইন আছে বর-কনের সপক্ষে। ভারতের আইনে যে কোন সাবালক-সাবালিকা স্বেচ্ছায় বিবাহ অথবা লিভ-টুগেদার করলে কারো কিছু বলার নেই, করার নেই। সামাজিক স্বীকৃতি না পেলেও তাদের কোন পরোয়া নেই। আধুনিক যুগের আধুনিক আইন, আধুনিক চাল-চলন। ছেলে-মেয়েরা সিনেমায় এ সবের ট্রেনিং পায়। 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া?' প্রেমের জন্য দিল দিলে জানও দেওয়া যায়। মা-বাপকেও কুরবানী দেওয়া যায়। ধর্ম, চরিত্র, লজ্জা, কুলমান সব কিছুকে বলিদান দেওয়া যায়। শেষে হয় প্রেমেরই জয়জয়কার। তাতে নাই-বা থাকল অন্য কিছু। লায়লী-মজনূ জিন্দাবাদ। প্রেম ছাড়া সবই বাদ!

নিরাশ হয়ে ফিরে এল বালাউন্নিসা ওরফে বেলির বাবা ও মামা। তারা ঘটনা চাপা দিয়ে রাখল। বেলির মামার এলাকায় দাপট আছে। সে শতভাবে মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। শক্তিতে হেরে গিয়ে ভক্তির পথ গ্রহণ করল।

একদিন বিকালে মামাতো বোন কলি এল বেলির বাড়িতে। চা খেয়ে দাওয়াত দিল তাদের বাড়ি যেতে। পরের দিন সকালে মুকুলের অনুমতি নিয়ে বেলি মামার বাড়ি বেড়াতে গেল।

মামীমা তাকে শত ক'রে বুঝাতে লাগল, 'বেলি তুমি কাজটা ভাল করনি। বকুলকে ছেড়ে মুকুলকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হতে পারবে না। মুকুলের কোন ভবিষ্যৎ নেই। সে অশিক্ষিত লম্পট। এর আগে দু'টো মেয়ে সে ছেড়েছে। মদ খায়, বিড়ি খায়। বউকে মারধর করে। সে কাপড়ের দোকানে চাকরি করে। আর বকুল শিক্ষিত ছেলে বড় ভদ্র। তার চাকরিটা হয়ে গেলে তুমি সুখী হতে।'

---চাকরিটা হলে না সুখী হতাম? আর এর যে দোকান রয়েছে। ব্যাংকে টাকা আছে।

---কে বলেছে তোমাকে? মুকুল বলেছে? মিথ্যা কথা। তোমার মামা জানে, দোকানটা ওর নয়। ও দোকানের কর্মচারী মাত্র। তাছাড়া ও কি ভালবাসে তোমাকে? ভালবাসার মর্ম ও জানে? আর বকুলের খবর জান তুমি। সে বেচারি কেঁদে আকুল। কত ভাবনা, কত অপেক্ষার পর শেষে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। তুমি ফিরে যাবে মনে ক'রে ৩/৪ দিন অপেক্ষার পর বাড়ি গেছে। তাও বলে গেছে, 'আমার বেলির সন্ধান পেলে, আমাকে খবর দেবেন। আমার বেলি আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না।'

এবার বেলি কাঁদতে লাগল। বকুল সত্যিপক্ষে যে তাকে ভালবাসে, তা সে জানে। আর মুকুলও ভালবাসে বলে মনে করে। সে তার পুরনো প্রেমিক। কলকাতায় যাওয়ার আগে বোলপুরে তার দোকানে আসা-যাওয়া ক'রেই প্রেম হয়। কলকাতায় থাকাকালে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ থাকে। ঈদের সময় বেড়াতে এসে সে তার কাছে গিয়েছিল এবং কলকাতা ফিরে যাওয়ার দিনে সে-ই সোনার আংটি উপহার দিয়ে ট্রেনে চাপিয়ে গিয়েছিল। যেদিন বকুলও তার জন্য বর্ধমান স্টেশনে অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু কোন্‌টা মেকি, আর কোন্‌টা খাঁটি, তা তার অজানা ছিল। আগে মুকুলের প্রেমিকা ছিল, বউ ছিল, তা তো জানত না সে। দোকানটাও যে তার নয়, তাও জানা ছিল না। মুকুলের তো সবটাই প্রবঞ্চনা, ধোঁকা। এখন সে কী করবে? এখন যদি বকুলকে পেতে চায়, তাহলে সে কি তাকে মেনে নেবে? সে ভাবল,

'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?'

মামীমা বলল, 'সে তুমি চিন্তা করো না। তুমি বাড়ি ফিরে গেলে বকুলকে বুঝিয়ে নেওয়া যাবে। ও খুব সরল ছেলে। তুমি বরং একটা কাজ করো, বিয়ে তো রেজিস্ট্রি হয়নি। কোর্টের যে কাগজটা আছে, তা খুঁজে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলো। অথবা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে যেয়ো।'

বেলি যদি এই পরামর্শ বাড়ির লোকের কাছে নিত, তাহলে হয়তো ধোঁকা খেতো না। মেয়ের বিয়েতে যে অভিভাবক থাকার শর্ত আছে ইসলামী বিধানে, সে শর্ত পালন করলে হয়তো বেলি ধোঁকা থেকে বেঁচে যেত। যোগ্য অভিভাবকরাই 'অন্ন দেখে ঘি ও পাত্র দেখে ঝি' দিয়ে থাকেন। কিন্তু ইসলামী বিধান মতে সে তো এখন ব্যভিচারিণী। এখন সে হারে হারে বুঝেছে, তার নিজের মনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কুফল।

বেলি চোখের কোণে জমে ওঠা পানি মুছতে মুছতে বলল, 'আমি আর আমার গ্রামে ফিরে যেতে চাই না মামী! সেখানে আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারব না। এখন তোমরা যদি পার, তাহলে এখান থেকেই ব্যবস্থা কর। আমার আব্বা দুর্বল ও সরল মানুষ, আর মামার দাপট আছে, ধার-ভার আছে, পারলে এখানেই বকুলকে ডেকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে কোন ব্যবস্থা কর।'

---ঠিক আছে। তোমার মামা এলে বলছি। তুমি বরং ফিরে গিয়ে কাল এসো।

মুকুল ধোঁকা দিয়েছে, সে একজন লম্পট, সে একজন ভণ্ড প্রেমিক, প্রেমের নাম ক'রে সে তার দেহ লুটেছে, পরবর্তীতে সে তাকে বর্জন করতে পারে---এই সকল কথা চিন্তা করতে করতে বেলির মনে মুকুলের প্রতি ঘৃণার পাহাড় সৃষ্টি হল। সে সিদ্ধান্ত নিল, সে আর মুকুলকে দেখাও করবে না। সুতরাং বাস ধরে বোলপুর গিয়ে এমন সময়ে বাড়ি ফিরল, যে সময়ে মুকুল দোকানে থাকে। সেখান থেকে সেই কাগজ ও তার ছবি নিয়ে এবং মুকুলের দেওয়া কোন কাপড়-চোপড় না নিয়েই সাথে সাথে বেড়িয়ে পড়ল। কেউ প্রশ্ন করলে সে মামার-বাড়ির কথা বলেই বিদায় নিল। যেহেতু সে মুকুলের কাছে মামার-বাড়ি যাওয়ার অনুমতি নিয়েই বেরিয়েছিল।

(১৩)

বেলির মামীমা শামীমা বেগম বড় চালাক মেয়ে। শহরের বলে তার কথার চটক আছে, ভারিক্কি আছে। সেই দায়িত্ব নিল বকুলকে বুঝাবার।

বকুলকে খবর দেওয়া হয়েছে। সে হয়তো আজই আসবে।

বেলিও ভুল স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রস্তুত মামীমাই তাকে শিখিয়ে দিয়েছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পদ্ধতি। ললনার ছলনা, চোখের পানি ও যৌবনের আকর্ষণ দিয়েই পুরুষ মানুষকে কাবু করা যায়, সে কথাও ভালভাবে জানিয়ে দিল।

মামা গ্রামের ইমাম সাহেবকে বলে রেখেছে। আজ রাতেই তাদের বিয়ে পড়াতে হবে। এখন বকুল রাযী থাকলেই হল।

আশানুরূপ বকুল এসে গেল। বাড়িতে প্রবেশ ক'রে চেয়ারে বসতেই বেলি কাঁদতে কাঁদতে তার সামনে এল। বকুল প্রশ্ন করল, 'তোমার কী হয়েছিল বেলি? তুমি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?'

তা শুনে বেলি আরো জোরে-শোরে কাঁদতে লাগল। মামীমা সামনে এসে বকুলের উদ্দেশ্যে বলল, 'ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না বাবা! আমরা সব বলব তোমাকে। ওকে জিজ্ঞাসা করলে ও খালি কেঁদে ওঠে। সেদিন পেটের যন্ত্রণায় ও বর্ধমান যায়নি। বোলপুরে ছোট থেকে মানুষ হয়েছে, এখানকার ডাক্তারদের সাথে জানাশোনা আছে। তাই এখানে চলে এসেছিল। তারপর কোন গুন্ডার হাতে পড়লে সে ওকে কী খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কোন ভাল মানুষের চোখে পড়লে সে থানায় খবর দিলে পুলিশ ওকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে তাদের হিফাজতে রাখে। তারপর আমরা খবর পেলে ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসে রাখি। ওর কোন ক্ষতি হয়নি। ভাগ্যের জোর। পুলিশের হাতে না পড়লে কী যে হত, তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয় বাবা!'

ইতিমধ্যে মামা পুলিশ কেসের একটি কাগজ এনে বকুলকে দেখাল। তাতে বালাউন্নিসা নাম দেখে বলে উঠল, 'এ নাম কার?'

---ওরই নাম বাবা! ওর আসল নাম বালাউন্নিসা। 'বেলি' বলে সবাই ডাকে। ও বড় লাজুক মেয়ে তা তুমি জান। কিন্তু সেদিন ও একা বোলপুর এসে যে কত বড় ভুল করেছে, তারই জন্য ও লজ্জিতা। বারবার ভাবছিল আর বলছিল, 'আমি বকুলকে কী বলে মুখ দেখাব?'

এবার বকুল বেলির প্রতি তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না বেলি। কিন্তু এখন তুমি ভাল আছ তো?'

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'হ্যাঁ। আর একা কোথাও যাব না। এবারে যেখানে যাব, তোমার সাথে যাব।'

বাস্! এক ডোজ ওষুধেই বিষ পানি হয়ে গেল। মামা-মামী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বিকালের দিকে বেলির মা-বাপ ও চামেলি-সহ তার স্বামী এসে উপস্থিত হল। দেরি না ক'রে মাগরেবের পরই ইমাম সাহেব রীতিমতো বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। তিনি একটু খোঁজও নিলেন না যে, এই সময় তার বিবাহ পড়ানো শরীয়ত-সম্মত কি না? আর জিজ্ঞাসা করলেও কি তাঁকে কেউ পাত্তা দিত? এইভাবেই তো অধিকাংশ প্রেমের বিয়ে ঢাকঢাক গুড়গুড় অবস্থায় হয়ে থাকে। কাজী সাহেবরা টাকার লোভে বিয়ে পড়িয়ে দেন। তাঁরা জানতে পারেন না অথবা জানতে চেষ্টাও করেন না যে, কনে কারো বিয়ে করা বউ কি না? অথবা তার গর্ভে পূর্বের কারো বাচ্চা আছে কি না? অথবা সে পূর্ব স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে আছে কি না? ব্যভিচারীদের ব্যাপারে এ সবের খোঁজ নিয়ে লাভ কী? সামাজিক চাপে বিয়েটা আনুষ্ঠানিকভাবে করছে, তাই খুব। তাছাড়া অনেকে তো বিয়ে না ক'রেই স্বামী-স্ত্রী হয়ে সংসার করছে!

বকুল-বেলির কুসুম-কলি আজ ফুটে উঠল। বকুলের পোষা প্রেম সফল হল। দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মাঝে এত এত কষ্ট হল সকলের।

তবুও তার প্রেম সার্থক হয়েছে বলে জানতে হবে। রফিকুল তার মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল, তা যে ভুল---তা স্পষ্ট হল। এখন সে সুখী। এখন সে ধন্য।

বাসরের ফুল-শয্যায় সে বেলিকে আর ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করল না। কারণ, মামীমা বলেছে, 'প্রশ্ন করলেই সে কাঁদতে লাগবে।' সুতরাং এ মধুরাতে শুধু শুধু তিক্ততা এনে লাভ কী? বকুল ফুল ও বেলি ফুলের রেণুতে রেণুতে শুধু মধু আর মধুই থাক। অজানা ব্যথা ও বেদনা অজানা থেকেই দূর হতেই মিলিয়ে যাক।

(১৪)

জ্ঞানিগণ বলেন, 'বিবাহের পর স্ত্রীর ইতিহাস জানতে চেষ্টা করো না। নচেৎ মধুর জীবন বিষে পরিণত হবে।' 'নারীর কলঙ্কে বিশ্বাস ক'রে পাপের ভাগী হওয়ার চাইতে অবিশ্বাস ক'রে ঠকাই ভাল।' 'চাঁদের এক পিঠ দেখেই মানুষ তাকে ভালবাসে।' বকুলও বেলির ব্যাপারে সেই সকল কথাই স্মরণে রেখে দাম্পত্য শুরু করল। সে যেন সুখী দাম্পত্য, আনন্দের সংসার।

বেলি নিজ ভুল সংশোধন ক'রে নিলেও তার মন থেকে দ্বন্দ্ব মুছে ফেলতে পারেনি। পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা কী? কোথায় বসবাস করবে? কীভাবে সংসার চলবে? অনুরূপ আরও কত রকমের প্রশ্ন তার মনে ভিড় করছিল। বেলির স্বপ্ন ছিল, ফুলের মতো জীবন। গ্রামে বাড়ি হলেও মন তার শহুরে। গ্রামে জন্ম হলেও মানুষ হয়েছে শহুরে পরিবেশে, তাই তার চাল-চলনও শহুরে। যে তরুণীদের সিনেমা দেখা অভ্যাস আছে, তাদের অনেকে চায়, তাদের স্বামী আধুনিক হোক,

হ্যান্সাম হোক, হিরোর মত হোক। আর এই যাদের মন, তারা অবশ্যই চাইবে স্বামী গাড়ি গাড়ি টাকা উপার্জন ক'রে আনুক। একটা ভাল বাড়ি হোক, একটা গাড়ি হোক ইত্যাদি।

এমন তরুণীরা 'কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট-পালঙ্গের আশ' করে। গরীব হলেও নায়িকার মত বাঁচতে চায়।

বেলিও তাই চেয়েছিল। বিশেষ ক'রে রূপের যোগ্যতায় তাতে সফলতা পাবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভাগ্যের হাওয়া তার তরীকে এমন কুলে ভিড়িয়ে দিচ্ছে যে, সে নিজেও তার সামাল দিতে পারছে না। এখনও সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, বকুলের সাথে সংসার ক'রে সে সুখী হবে। বিয়ের আগে যে দ্বন্দ্ব ছিল, আজও সেই দ্বন্দ্ব তাকে কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে।

যে মানুষ ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, সে মানুষ আদৌ সুখী হতে পারে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাওয়া মানুষের মনকে অভাবী ক'রে তোলে। বেলির মন ছিল তেমনই অভাবী। বেলি জানে না যে, বিত্ত থেকে চিত্ত বড় জিনিস। সে মানে না যে, 'ধন থাকলে ধনী, গুণ থাকলে গুণী, ধনীর চেয়ে অনেক আগে গুণীজনকে গুনি।'

ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নকে যারা বাস্তব দেখতে তাড়াহুড়া করে, তাদেরই মন সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করে। বেলিও তাই করেছে, করতে চলেছে।

বেলি জানতে পারল, বকুলের চাকরির কোন ব্যবস্থা হয়নি, আর তারা মা-বাবাও তাকে ঘরে তুলবে না, হয়তো তাকে সেই কলকাতার পীর-বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আবার ফিরে যেতে হবে। সুতরাং তার কী এমন লাভ হল? মামা-মামী তার কী এমন উপকার করল? ছেলে

ভাল? যার টেঁকে টাকা নেই, সে আবার ভাল ছেলে?

তার মন আবার আকৃষ্ট হতে লাগল মুকুলের প্রতি। সেও বকুলের চাইতে কম নয়। তার উপার্জন আছে। বকুল গেঁয়ো, কিন্তু মুকুল শহুরে। আর মামী তার যে সকল বদ্‌গুণ উল্লেখ করেছে, তার সবটা সত্যি নাও হতে পারে। সে নিজে তার পরশে থেকেছে। সে তার পুরনো প্রেমিক। বকুলের সাথে মিলামিশার চাইতে বেশি মিলামিশা তার সাথে। সে অন্য কোন মেয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, কিন্তু তার সাথে তো করেনি। এমনও তো হতে পারে যে, সেই মেয়েগুলিই খারাপ ছিল, যাদের প্রতি মুকুল দুর্ব্যবহার করেছে।

বিবাহের প্রাথমিক দিনগুলি মনোমতো স্ত্রীর সাথে সবচেয়ে বড় সুন্দর কাটে। মানুষের জীবনের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। তাতে আবার মামার বাড়ির আব্দার। বকুলের দুশ্চিন্তাময় জীবন নব জীবনের বসন্ত ফিরে পেল।

সে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়, আশা দেয়, অভয় দান করে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু বেলি যেন উদাস মনে সে-সবে কোন গুরুত্ব দেয় না। কেবল বলে, 'আগে আপনার চাকরি হোক, তবেই না সুখের স্বপ্ন দেখব। শান্তির ঘুম না হলে কি জেগে জেগে চোখ বন্ধ ক'রে স্বপ্ন দেখা বোকামি নয়?'

বকুল প্রেমাবেগে নম্রকণ্ঠে বলে, 'ধৈর্য ধর বেলি! তোমার প্রেম আমার সাথে থাকলে আমি কৃতকার্য হব। চাকরি না পেলেও ছোটখাট একটা ব্যবসা করব। পেট যখন আছে, তখন চালাতে তো হবেই। তুমি ভয় করো না যে, আমি তোমার মা-বাপের ঘরে ঘর-জামাই থেকে যাব। যদিও তোমাদের ঘর-জামাই প্রয়োজন। কিন্তু আমি চাই না। কারণ

আমি জানি, 'ঘর-জামাইয়ের পোড়া মুখ, মরা-বাঁচা সমান সুখ।' 'শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।' শ্বশুর-বাড়ি তো দূরের কথা---শ্বশুর গ্রামেও বাস করলে মানুষের মান থাকে না। আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়িতেই রাখব। আমার বাড়িতেও পুরুষ মানুষের দরকার। আমি আমার গ্রাম বা বাড়ি ছাড়া বাইরে কোথাও থাকব না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ঠিক তোমাকে নিয়ে যাব। তবে বাইরে কোথাও চাকরি হলে আলাদা কথা।'

অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বেলি বলল, 'হুঁঃ! আপনার বাড়িতে বউ হয়ে যাব, তারপর পণবন্দী হয়ে পণ-যৌতুকের শিকার হয়ে যাব। আপনার মা-বাপ ও বোন আমার প্রতি গঞ্জনা-ভর্ৎসনার চাপ সৃষ্টি করবে, যাতে আমি বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক নিয়ে যেতে পারি। আর তা না পারলে কলসির জলে ডুবে মরি। তাই না?'

---তুমি বড় নিরাশাবাদী মেয়ে। আরে আশাবাদী হও, আশাবাদী। তবেই মনে সাহস পাবে। জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবে। বিপদ আসলে অধৈর্য হওয়ার মতো বড় বিপদ অন্য কিছু নেই। আর বিপদ আসলে বিপদকে ধৈর্যের তরবারি দিয়ে কেটে ফেলার মতো বীরত্ব অন্য কিছুতে নেই।

---আপনি আমাকে পেয়ে খুশী হয়েছেন?

---তোমাকে হারিয়ে কত কষ্ট পেয়েছি, তা শুনলে তুমি বুঝবে আমি কতটা খুশী হয়েছি। তুমি কি আমাকে পেয়ে খুশী হওনি?

---একজন অসহায় নারী সহায়রূপে স্বামী পাবে, অথচ সে খুশী হবে না---এমন হতে পারে?

---হতে পারে, স্বামী সে পেয়েছে, কিন্তু পছন্দের নয়। অবশ্য আমি তোমার জন্য সে কথা বলছি না। কারণ, তুমি আমাকে কলকাতাতেই

পছন্দ করেছ, হাতে হাত রেখে ওয়াদা করেছ। আমি বলছিলাম, তোমার ঐ কুরআনের মাষ্টার রফিকুলের কথা। ও তো আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে ফেলেছিল।

---কী বলেছে ও? ও কি আমাকে ভালবাসে বলেছে?

---না-না, তা নয়। যাকগে যা নয়, তা নিয়ে আর আলোচনা ক'রে লাভ নেই। চলো কোথাও বেড়াতে যাই।

---কোথায় যাবেন?

---এই বোলপুরের কোন পার্কে অথবা মার্কেটে।

কিন্তু বিকালে চা খাওয়ার পর মামাকে বললে মামা বলল, 'না। বাজারের পরিস্থিতি ভাল নয়। বরং যাবি তো নিজের গ্রামে যা। সেখানে কিছুদিন বেরিয়ে আয়।'

বকুল বলল, 'বেলির জন্য কিছু কাপড়-চোপড় নিতে হত। বেশি রাত হওয়ার আগে আগেই ফিরে আসব।'

বাজার করতে করতে বেলি মুকুলের নজরে পড়ল। যেহেতু বেলি নিজেকে গোপন করতে চায়নি। জামাইয়ের দোকানে বসিয়ে দিয়ে বেলি কলিকে সাথে নিয়ে সাহস ক'রে মুকুলের দোকানে গেল। নির্জনে পেয়ে বেলি মুকুলকে শাসিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, তুমি প্রতারক। তুমি এ দোকানের একজন চাকর, অথচ তুমি আমাকে বলেছ, দোকানের মালিক। তোমার আগে বিয়ে হয়েছিল......।'

---মুকুল যেন কোন এক সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা ক'রে শান্তভাবে বলল, 'বেলি! বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি। আমি তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু তুমি আমাকে কিছু না বলেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে। তবুও আমি তোমাকে বলছি, তোমার জন্য আমার হৃদয়

ও বাড়ির দরজা সর্বদা খোলা আছে। তুমি বিয়ে না করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষায় থাকব।

মুকুল তখনও জানে না যে, বেলি অন্য কাউকে ভালবাসে। যে মেয়ে একাধিককে ভালবাসতে পটিয়সী, সে কি সহজে বুঝতে দেবে যে, সে অন্য আর এজনকেও ভালবাসে? সে তো বলবে, 'আমি তো তুমি ছাড়া আর কারও দিকে তাকিয়েও দেখি না।'

কলির ভয় হল। সে বেলিকে টেনে নিয়ে দোকান হতে বের হয়ে এল। সে বেলিকে বলতে লাগল, 'তুমি আবার কেন ওর আবেগকে সুড়সুড়ি দিচ্ছ? তুমি তো বর্তমানে আর একজনের অধিকারে।'

বেলি কলিকে বলতে লাগল, 'জান কলি! আমি এখনও নিশ্চিত নই, কে আমার পক্ষে ভাল হতো? এখনও আমি বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তুমি বলতে পার বোনটি? আমার ভাগ্যে কী আছে?'

---সে কি কেউ বলতে পারে। তবে এটা বলতে পারি যে, আফোটা মুকুল থেকে ফোটা বকুল অনেক ভাল। আর তুমিও ফোটা বেলি। আমি তো এখনও কলিই থেকে গেলাম।

কথাগুলি বলেই কলি হাসতে লাগল। বেলি বলল, 'কাউকে যেন বলে দিয়ো না, আমরা মুকুলের কাছে গিয়েছিলাম।'

---তাই বলা যায়? জানতে পারলে তো আব্বা আমাকে যবাই ক'রে দেবে!

ক্ষণেকের মধ্যে চামেলীদের দোকানে ফিরে এল তারা। সেখান থেকে নির্বিঘ্নে ফিরে গেল বাসায়।

(১৫)

ওদিকে মুকুল বসে নেই। সে খবর নিয়ে জানতে পারল, বেলি অন্য ছোঁড়াকে বিয়ে ক’রে ফেলেছে। এতে কি তার রাগ না হয়? এবারে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা তার মনে জাগল। উপেক্ষা করার শাস্তি কী ভাবে দেওয়া যায়, তার পরিকল্পনা করতে লাগল। বেলির মামা-মামীকে ফাঁকি দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল। সেই সাথে কত প্রলোভন দিতে লাগল। ‘তুমি ভুল শুনেছ। দোকান আমারই। মোটর সাইকেল বিক্রি ক’রে গাড়ি নেব। বিল্ডিং করব। তোমার ভয় হলে তোমার নামে ফিক্সড্-ডিপোজিট ক’রে দেব......।’

নারী পুরুষকে নিজ রূপ-যৌবন দিয়ে ভুলাতে পারে। আর পুরুষ নারীকে ভুলাতে পারে অর্থ-সম্পদের লোভ দেখিয়ে। লোভী মানুষ তাতেই বিপদে পড়ে।

পক্ষান্তরে বকুল সাদা মনের। তার মনে শুধু প্রেম আর প্রেম আছে। কিন্তু কেবল প্রেম দিয়ে কি লোভী মানুষের মন জয় করা যায়?

আবারও মুকুলের সাথে যোগাযোগ শুরু হয়েছে জেনেই বেলির মামা মুকুলের দোকানে গিয়েছিল। তাকে বুঝাবার জন্য এবং এই বলার জন্য যে, ‘তুমি ওর পিছু ছেড়ে দাও। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে স্বামী নিয়ে সংসার করছে, তাকে আর প্রলুব্ধ করো না।’

কিন্তু মুকুলের দাবী, বেলি তার বিয়ে করা বউ। সে তার সাথে বহু দিন কাটিয়েছে। তারপর আপনারাই তাকে আমার বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে তুলে নিয়ে গেছেন। আর দেখবেন, বেলি আমার এবং সে একদিন আমার কাছেই ফিরে আসবে। আপনারা একজন লেলাক্ষেপার সাথে তার বিয়ে দিয়েছেন।

---লেলাক্ষেপা সে নিজেই পছন্দ করেছে। আজ-কালকার মস্তানরা ভদ্র ছেলেদেরকে লেলাক্ষেপাই মনে করে। শুধু গায়ের জোর, বাহ্যিক চাকচিক্য ও গরম পকেটের প্রভাবে ভালবাসার অভিনয় ক’রে সাদা মনের মেয়েদেরকে শিকার ও নষ্ট করে।

---আর মেয়েরা বুঝি তেমন নয়? যেখানে যাকে ভাল লেগে গেল, তার সাথেই প্রেমের অভিনয় ক’রে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিলাম। এটা কি অন্যায় নয়?

---অবশ্যই। বেলি যদি সেরূপ ক’রে থাকে, তাহলে সে অন্যায় করেছে। কিন্তু আমি তার গার্জিয়ান হয়ে তোমার কাছে অনুরোধ করছি, ওকে আর আকর্ষণ করো না। ও যখন খারাপ, তখন ওকে ছেড়ে দাও, ওকে স্বামী নিয়ে নিজের ঘর বাঁধতে দাও।

---আমিও তো ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম সাহেব! আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। অথচ আমার সাথেই ওর প্রথম পরিচয়। সাবালিকা হওয়ার আগে থেকেই আমার দোকানে ওর আসা-যাওয়া। আমিও ওকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে ঘর পায়ে ক’রে ঠেলে ভেঙ্গে দিয়ে গেল।

---আসলে এই শ্রেণীর ভঙ্গুর ঘরগুলি অল্প আঘাতেই ভাঙ্গে মুকুল। সুতরাং ভাল হবে, তুমি অন্য কাউকে নিয়ে মজবুত ঘর বাঁধো। তুমি তো দোকান থেকেই সেই রকম কিছু একটা চয়েস করতে পার।

---আমাকে বাধা দেবেন না, হুমকিও দেবেন না। কারণ, তাতে আপনাদেরই ক্ষতি হবে। বেলিকে তো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর ক’রে আনতে যাচ্ছি না। সে যদি এসে আমার ভাঙ্গা ঘর আবারও বাঁধতে চায়, আমি তাকে সাদরে গ্রহণ করব।

মামা নিরাশ হল, অবাকও হল। আজব মন, আজব রুচি! যে মেয়ে একজনকে ছেড়ে আর একজনের কাছে গিয়ে স্ত্রী হয়ে বসবাস করে,

সেই মেয়েকেই স্ত্রীরূপে পেতে এত আগ্রহী কেন? নাকি শুধু বদলা নেওয়ার ইচ্ছা? ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয় মামার। তবুও তার দাপট আছে, পার্টি হাতে আছে। থানা-পুলিশও হাতে আছে। সুতরাং তত ভয় তার নেই। আর মান-সম্মানের ব্যাপার তো কিছুই নয়। আজ-কালকার যুগে কোন্ বাড়ি এমন আছে, যে বাড়ির কোন একজন সদস্যও এই শ্রেণীর মানহানিকর ঘটনায় জড়িত নয়? হাজী-বাড়ি থেকে নিয়ে পাজি-বাড়ি পর্যন্ত একই অবস্থা। পর্দা-বেপর্দা সকল পরিবেশের অবস্থা তথৈবচ। তাহলে কে কার বিরুদ্ধে আর আঙ্গুল তুলবে? সবাই নিজ নিজ চরকায় তেল দিতে ব্যস্ত।

দেশের আইনে যুবক-যুবতীর বন্ধুত্ব কোন অপরাধ নয়। বিনা-বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রেখে সন্তান জন্ম দেওয়াও কোন দোষের নয়। 'মিঞা-বিবি রাযী, তো কিয়া করেগা কাযী'---এই হল দেশের শাসন-ব্যবস্থার সংবিধান। তাহলে আবার চিন্তার কী, করারই বা কী? যা হবে, সময়ে তা সামাল দেওয়া যাবে। নো চিন্তা, ডু ফুর্তি।

(১৬)

যে কয়দিন মামার বাড়িতে থাকল, সে কয়দিনের নামাযও তাকে তোলা গেল বকুলের। কিছু মানুষ আছে, যারা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলে। তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা নেই। সঠিক দ্বীনদারী থাকে না বলেই তো মানুষ অবৈধ প্রেম-ভালবাসায় লিপ্ত হয়। মামার বাড়ির কেউ নামায পড়ে না। বেলিও পড়ে না। অতএব সে একা পড়ে কীভাবে। অথচ হুজুরদের বাড়িতে নামায বাদ দেওয়ার উপায় ছিল না। চাকরির জন্য নামায? চাকরি তো এখনও হয়নি। তাহলে কী তার

খেয়াল-খুশি নয়? আসলে ভরসা তার হুজুর সাহেব।

তাছাড়া এ সপ্তাহ তার আনন্দে ভরা প্রেমকেলির সময়। পবিত্রতার ঠিক থাকে না বলেও নামাযের প্রতি গুরুত্ব নেই। বাড়িতে টিভি আছে। তাই নিয়েই পড়ে থাকে সর্বক্ষণ। তাতেও আবার বেলির শখ, নতুন বই নেমেছে 'চিত্রা' হলে, আজ রাত্রের শো দেখতে যেতে হবে। বকুলের কোন বাধা নেই, বাধা থাকতে পারে না। সে তো বেলিকে পাওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকেও পর্যন্ত কুরবানী দিয়ে ফেলেছে। এখন সে বেলির প্রেমপ্রার্থী, স্ত্রীর আঁচল-ধরা একনিষ্ঠ ভক্ত। সে যা বলবে, তাই হবে।

মামা যাই হোক, মামী বড় চালাক। বেলির হাবভাব তাকে ভাল দেখাচ্ছিল না। তার উপর আবার জানি না, কলি মাকে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে কি না? কোন্ ফাঁকে বেলি-মুকুলের কোর্ট-ম্যারেজের কাগজটি তার ব্যাগ থেকে বের ক'রে নিয়েছে। নচেৎ যদি বকুল দেখে ফেলে।

সিনেমায় যেতে মামার মত ছিল না, মামীরও না। বাড়িতে টিভি রয়েছে, তাতে কত সিরিয়াল আসছে, বইও আসছে। তবুও কেন হলে যেতে হবে?

বেলি মানল না, বকুলও তার সমর্থনে রায় দিল। সঙ্গে কলি যাবে। তারও জীবনে ছিল যৌবনের কাকলি। দোলাভাই তো। নতুন জামাইয়ের সাথে একটু আনন্দে বাধা দিলে হবে কেন? তাছাড়া বকুল তো বড় ভদ্র ছেলে। তবুও উপহাস ছলে কলি মিছামিছি আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমি আপনাদের কাবাবে হাড্ডি হতে চাই না।'

বকুল হেসে বলল, 'তাহলে তুমিও কাবাব হয়ে যেয়ো।'

মহাসমারোহে তিনজনে সিনেমায় গেল। শো শুরু হল। বকুল বাদাম কিনে নিয়েছিল, তাই খাচ্ছিল তিনজনে। বইয়ের বিষয়-বস্তুও অন্ধ

প্রেমই ছিল। হঠাৎ বেলি কলিকে বলল, 'আমাকে পেশাব লেগেছে। তোমরা বস, আমি আসি।'

কেউ আপত্তি করল না, আর করবেই-বা কেন? তার সাথেও উঠে গেল না, আর যাবেই বা কেন? বকুল-কলির মনে তো কোন সন্দেহ ছিল না।

বেলি বেরিয়ে গেল হল থেকে। বাইরে মুকুল মোটর-বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল, চড়ে বসে চলে গেল তার সাথে।

দেরি হতে দেখে প্রথমে সন্দেহের কলি ফুটল কলির হৃদয় ডালে। সে দোলাভাইকে বলল, 'দোলাভাই! বুবু যে দেরি করছে।'

উদাস বকুল পর্দার উপরেই নজর রেখেই বলল, 'হয়তো পায়খানা করছে, চলে আসবে।'

আরো দশ মিনিট গেল, বেলি এল না। এবারে কলি বলল, 'আমি ল্যাটরিনে দেখে আসি।'

'তাই যাও' বলে বকুল নায়িকার স্বামীর চোখে ধূলা দিয়ে নায়কের সাথে পলায়ন-কীর্তি দেখতে মগ্ন রইল।

কলি ফিরে এল একাকিনী। তার চোখে-মুখে ঘাবড়ানোর ছাপ। ঘন ঘন শ্বাস ছেড়ে বলল। 'দোলাভাই! বুবু তো ল্যাটরিনে নেই।'

বকুল উদাস ভাবেই বলল, 'তুমি যেটা দেখে এলে, সেটাতে হয়তো নেই। অন্য ল্যাটরিনে গিয়ে দেখ।'

---অন্যটা তো পুরুষদের। ওখানে কেন যাবে? তবুও আপনি যান, দেখে আসুন।

বকুল যেন খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করছ। একেবারে হাঁপিয়ে গেছ কলি!'

---সত্যিই আমাকে ভয় লাগছে। বুবুকে যদি আবার গুন্ডারা ধরে নিয়ে যায়।

তাইতো। এবার বকুলের ইতিহাস মনে পড়েছে। সে ইতিহাস যেন তার আনন্দের হালখাতায় চাপা পড়ে ছিল। চট্ ক'রে উঠে পুরুষ শৌচাগারের দিকে ছুটল। সেখানে মহিলা যাবে কেন? জিজ্ঞাসা করল, দ্বিতীয় কোন লেডিজ বাথরুম আছে কি না? জবাব নেতিবাচক পেয়ে হলের বাইরে গেল। একটু দূরে খোঁজাখুঁজি করতেই দু'জন যুবক এসে তার নাকে-মুখে বেদম ঘুসি মারতে শুরু করল। রক্তাক্ত অবস্থায় সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। তারপর যুবক দু'টি কাল বিলম্ব না ক'রে সটান চম্পট দিল।

নিরাপত্তারক্ষী গার্ড থানায় ফোন ক'রে দিলে পুলিশ বকুলকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল। কলি একটি রিক্সা ক'রে বাড়ি ফিরে বাপ-মাকে খবর দিল।

বেলির মামা পস্তিয়ে বলতে লাগল, 'আমার এই ভয়টাই ছিল। এই জন্যই আমি বাজারে যেতে নিষেধ করছিলাম। নিশ্চয় এ কাজ শয়তান মুকুলের।

মোটর বাইক নিয়ে ছুটল থানায়। তখনও বকুলের জ্ঞান ফেরেনি। থানা ওসির সাথে বেলির মামার পরিচিতি আগে থেকেই আছে। ওসির কেসটা বুঝতে বেশি দেরি হল না। মুকুলের নামে কেস ফাইল হয়ে গেল।

কিন্তু এটি অপহরণ, না পলায়ন? অপহরণ এই ভাবে সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই পূর্ব যোগাযোগের পরে পরিকল্পিতভাবে বেলি পলায়ন করেছে। কিন্তু বকুলের জ্ঞান ফিরলে তাকে বুঝানো হল, ঘটনা হল অপহরণের। যদিও উদাস মনে পূর্ব হতেই সে নিজেও তাই বুঝেছিল।

মামা-শ্বশুরের বাইকে চড়ে হাসপাতাল, তারপর হাসপাতাল থেকে বকুল চোখের পানি মুছতে মুছতে বাসায় ফিরল। কেউ তাকে বুঝতে দিল না যে, আসলে বেলিই বিশ্বাসঘাতিনী। বেলিই তাকে এই অপ্রীতিকর ঘটনার নায়ক বানিয়েছে।

সকাল হল, সারা দিন গেল। বেলির কোন খবর পাওয়া গেল না। মুকুলের বাড়িতে তালা ঝুলছে। পুলিশেও কোন পাত্তা করতে পারেনি।

সারা দিন কেঁদেছে বকুল। রাত্রেও কাঁদছিল। মামী বুঝায়, কলি বুঝায়, কিন্তু বকুল বুঝ মানে না। সেই বিয়ের দিন শ্বশুর গ্রামে যেভাবে নিজেকে শোকাকুল ক'রে তুলেছিল, এখনও সেই শোকের নতুন ঝড় তার বুকে-মুখে-চোখে। কে বলবে সে অশ্রু-ঝর্‌ঝর্‌ চোখ কোন পুরুষ মানুষের? পুরুষের চোখেও এত অশ্রু ঝরে? তার অবস্থা দর্শনে মামীর চোখেও অশ্রু আসে। কোন্‌ বাপ-মায়ের ছেলে এখানে এসে এভাবে ধোঁকা খেল, মার খেল। তাদেরও কি উচিত হল তাকে এইভাবে ধোঁকা দেওয়া? কিন্তু নাক যে নিজের, সুতরাং তা কাটাও তো মুশকিল।

মামা বলল, 'বাবা বকুল! কাল সকালে তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বেলির খবর পেলে তোমাকে জানাব।'

কিন্তু বকুল 'হো-হো' ক'রে কেঁদে উঠে বলল, 'কিন্তু মামা! সেখানে আমাকে সান্ত্বনা দেবে কে? বেলির ব্যাপারে সবাই আমার পর। আমি সেখানে একা একা অজানা ঘটনা জানার অপেক্ষায় দগ্ধে দগ্ধে মরব। বলুন মামা! আমি কি আত্মহত্যা করব?'

---না বাবা! আত্মহত্যা কেন করবে? দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলেই যদি মানুষ আত্মহত্যা করে, তাহলে তো পৃথিবীতে কেউই বাঁচতে পারে না। বিপদ সকল মানুষেরই আসে। আবার বিপদ দূর হয়। তোমারও বিপদ

কেটে যাবে। বেলি ফিরে আসবে।

বকুল বুঝল, এইভাবে বউ নেই আর বউয়ের কোন আত্মীয়ের ঘরে বসে থাকাও শোভা পায় না। সুতরাং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল। আগামী কাল সকালে বিশ্বভারতী ট্রেনে সে বাড়ি ফিরে যাবে।

(১৭)

প্রায় মাস খানেক গত হয়ে গেল। পুলিশে কোন হদিস দিতে পারল না। ইতিমধ্যে বকুল শ্বশুর গ্রাম এল খোঁজ নিতে। এখানে সেই রফিকুলের সাথে দেখা। কুশলাদি বিনিময়ের পর রফিকুল বকুলকে জিজ্ঞাসা করল, 'বেলির খবর কী?'

বকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'কোন খোঁজ নেই।'

---আপনি কি এখনও মনে করেন যে, ঘটনা অপহরণের?

---আপনিও কি এখনও মনে করেন যে, ঘটনাটা নজরুলের 'এরা দেবী---এরা লোভী'দের?

---আমার তো তাই মনে হয়। আমার মনে হয়, আপনি খামোখা মরীচিকার পিছনে পানি মনে ক'রে দৌড় দিচ্ছেন। অবশ্য এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। জরুরী নয় যে, আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। দেখুন, খুঁজুন। নিশ্চয় আবার তাকে ফিরে পেয়ে খুশী হবেন। আমি নেহাতই দ্বীনদারীর খাতিরে বলছিলাম আপনাকে। একজন ভাল লোক একজন মন্দ মেয়ের পাল্লায় পড়ে কষ্ট পাবে, সেটা কোন মুসলিমের কাম্য হওয়া উচিত নয়।

---আপনি কি আমার স্ত্রীকে মন্দ বলতে চান? আপনাদেরকে

মাদ্রাসায় এই পড়ানো হয়? লোকের মেয়েদের প্রতি কুধারণা ও সন্দেহ পোষণ করা কি মুসলিমের কাজ?

বকুল রফিকুলের উপর ক্ষেপে উঠল। সে যেন বেলির বিরুদ্ধে কোন কটূক্তি শুনতেই চায় না। বেলির প্রতি তার এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস যে, তাতে কোন প্রকার মলিনতা নেই। যে অন্ধ বিশ্বাস মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, বকুলের ছিল তাই।

তবুও বুঝাবার চেষ্টায় তাকে আবারও বলল, 'জল জঙ্গল নারী, এ তিনে বিশ্বাস নেই, বড় মন্দকারী। আর কবির কবিতা পড়েননি?'

'না কর ধারণা শূন্য রহে প্রতি বন,
থাকিতেও পারে ব্যাঘ্র করিয়া শয়ন।'

'ঝিনুক মাত্রেই কি মুক্তা থাকে?'

বকুল লাল হয়ে বলল, 'আমার ঝিনুকে মুক্তা আছে।'

এবার রফিকুল দেখল, 'তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবি ভুলবার নয়।' সুতরাং সে বকুলের নিকট মাফ চেয়ে নিল। ভুল স্বীকার করল; সুপরামর্শ দেওয়ার ভুল। অন্ধ-বিশ্বাসের আরও অনেক ভুল রয়েছে তার মধ্যে, সেগুলির প্রসঙ্গই তো তোলা যাবে না। যে মানুষ অপরকে ওয়াহাবী বলে জানে এবং ওয়াহাবীকে ভ্রষ্ট জ্ঞান করে, সে মানুষ কি তার নিকট থেকে কোনও সুপরামর্শকে উদার মনে গ্রহণ করতে পারে? বকুলের ডান হাতের বাজুতে দু-দু'টি তাবীয বাঁধা। তার মধ্যে যে কত পরিমাণের শির্কী অন্ধ-বিশ্বাস আছে, সে কথা বললে কি বকুল মেনে নেবে? তবুও চেষ্টা করল রফীক।

হঠাৎ বকুলের বাজুতে হাত রেখে বলে উঠল, 'আচ্ছা বকুল ভাই। এখন তো আপনি আমাদের দোলাভাই! একটা কথা বলব? না-না

বেলি সম্বন্ধে নয়। আপনার এই তাবীয-জোড়া সম্বন্ধে। এতে আপনার কি কি উপকার হয় বলে বিশ্বাস করেন?

বকুল রাগেনি, তবে উত্যক্ত হয়ে উঠল, বলল, 'এই মোল্লা গোছের লোকদের কাজ শুধু খুটখুট করা। এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে যেন আপনাদের ভাত হজম হয় না।'

---রাগ করবেন না প্লিজ! আসলেই 'মোল্লা'দের অভ্যাস, 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ চড়ানো।' আর এই জন্যই ঐ শ্রেণীর কটূক্তি শুনতে হয়। তারা প্রায় সময় 'পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে আসে আপন মু।' আসলে তাবীয বাঁধা যে অবৈধ, তা জেনেই আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম আর কি? কাগজের চিরকুটে 'আগুন-আগুন' লিখে যদি খড়ের গাদায় ভরে দেওয়া হয়, তাহলে কি আগুন লাগবে?

---কাগজে আপনার নাম ধরে গালি লিখলে কি আপনার গায়ে লাগবে না?

---সে তো আমি পড়লে লাগবে। কিন্তু যদি আপনি চাকরি হওয়ার জন্য তাবীয বাঁধেন, তাহলে কি তার আবেদন চাকরি নিজে পড়বে, নাকি চাকরি-দাতা? তার চাইতে কি সরাসরি আল্লাহর কাছে চেয়ে নেওয়া ভাল নয়?

---অনেক সময় কাজ তো হয়।

---সে তো লোকে বলে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।' লোকে তো কুমীর-পীরের আস্তানায় গিয়ে কুমীর পাকের কাছে সন্তান পায়। পাথরের নিথর মূর্তির কাছে সুখ-সমৃদ্ধি পায়। আপনি কি এ সবেও বিশ্বাস করেন? আপনি বলুন, আপনি যে উদ্দেশ্যে তাবীয বেঁধেছেন, তা কি পূরণ হয়েছে?

---না, তা হয়নি। হয়তো পরে হবে।

---হয়তো হবে। আর হলে আপনি মনে করবেন আপনার ঐ তাবীযের জোরেই হয়েছে, তাই না? এটাই তো অন্ধ বিশ্বাস।

---তাহলে হয় কিসের জোরে?

---আপনার ভাগ্যের জোরে।

---তাহলে ওষুধ খাওয়াও চলবে না?

---তা তো কেউ বলে না। বরং আপনার শরীয়ত আপনাকে ওষুধ খেতে বলেছে। দেখুন, তাবীযে যদি সত্যিই কাজ হতো, তাহলে যে মহিলা সন্তান লাভের জন্য তাবীয বাঁধে, সে মহিলা সন্তান বন্ধ করার জন্যও তাবীয বাঁধত। কিন্তু তা বাঁধে কি?

---সব রোগে কি সব ওষুধ কাজে লাগে?

---যেটা ওষুধ নয়, সেটাকে ওষুধ মনে করা কি ভুল নয়?

বকুল যেন অনর্থক সময় ব্যয় মনে করছিল। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে আবার সে নিজেই বেলির কথায় এল। যেহেতু তার মনে-মগজে-রক্তে তখন বেলির ভাবনাই সঞ্চারিত আছে। সে বলল, 'যাক্‌গে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ যদি কুরআন হাতে কসম ক'রে কিছু বলে, তাহলে আপনি বিশ্বাস করবেন না কি?'

---অবশ্যই করব।

---বেলি আমাকে কুরআন হাতে কসম ক'রে বলেছে, সে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসে না।

রফিকুল অট্টহাসি হাসতে লাগল। বকুল যেন কথাটি বলে বেওকুফ হয়ে গেল। বলল, 'আরে আরে! আপনি হাসছেন যে? এটা কি বিশ্বাস্য নয়?'

---আপনি আজব অন্ধ-বিশ্বাসী।

---কুরআনকেও বিশ্বাস করলে অন্ধ-বিশ্বাসী হতে হয়?

---আপনি তো কুরআনকে বিশ্বাস করছেন না। আপনি যার হাতে কুরআন আছে, তাকে বিশ্বাস করছেন। কিন্তু তার কুরআন ও কসমের প্রতি কতটা বিশ্বাস আছে, তা দেখতে হবে তো। কোন্ কৌশলে কসম করছে, তা বুঝতে হবে তো। আপনাকে একটি গল্প বলি,

বনী-ইসরাঈলের এক সুন্দরী অন্যাসক্তা ছিল। স্বামীর সন্দেহ হলেও স্ত্রী পাত্তা দিল না। শহরের বাইরে এক পাহাড় ছিল। সেখানে তারা সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য কসম খেত এবং যে মিথ্যা কসম খেত, সে ধ্বংস হয়ে যেত।

একদা স্বামী বলল, 'তোমাকে আমার সন্দেহ হয়।'

স্ত্রী বলল, 'আমার জীবনে তুমি ছাড়া আমার গায়ে কেউ হাত দেয়নি, আর তুমি আমাকে খামোখা সন্দেহ করছ।'

আল্লাহর নামে কসম শুনে স্বামী বিশ্বাস ক'রে নিল ঠিকই, কিন্তু সে তার চোখকে অবিশ্বাস করতে পারল না। তাই সে বলল, 'তাহলে পাহাড়ের নিকট এ কথার উপর কসম খেতে হবে তোমাকে।'

মেয়েটি পড়ল চিন্তায়। উপপতি এলে তার কাছে ঘটনা খুলে বলল এবং এক কৌশলের কথাও তাকে জানিয়ে রাখল।

পরদিন স্বামী-স্ত্রী বের হল শহরের বাইরে কসম খেতে। পথে বের হতেই স্ত্রী ছলনা ক'রে চলতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। ওদিকে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী উপপতি রাস্তার মোড়ে গাধা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। স্ত্রী স্বামীকে গাধা ভাড়া করতে পরামর্শ দিল। পরিশেষে উপপতির ভাড়া করা গাধাতে চড়ে সেই পাহাড়ের ধারে যেতে যেতে

ইচ্ছা ক'রেই স্ত্রী গাধা থেকে পড়তে গেল। সাথে সাথে গাধা-ওয়ালা ও তার স্বামী তাকে ধরে বসিয়ে দিল। অতঃপর সেখানে পৌঁছে সে কসম খেয়ে বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি আর এই গাধা-ওয়ালা ছাড়া আর কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।'

সে কসমে সত্যবাদিনী ছিল, কিন্তু সে ছিল আসলে ছলনাময়ী। মিথ্যা কসমের জন্য পাহাড় ভেঙ্গে পড়তে লাগল এবং এক সময় সে ধ্বংস হয়ে গেল।

আপনি হয়তো বলবেন, 'আপনার বেলি ঐ শ্রেণীর কসম খায়নি।' আর সে কথা আপনিই বুঝতে পারবেন আগামীতে।

(১৮)

লাভপুরে মুকুলের খালার বাড়ি। সেখানে সে দ্বিতীয় অষ্টমঙ্গলার দিনগুলি অতিবাহিত করছে। তবে খুবই সতর্কতার সাথে ভয়ে ভয়ে। অবশ্য সে যেমন বেলির মত সুস্বাস্থ্যবতী সুন্দরীর দেহখানি পেয়েছে, তেমন তার মনখানি পায়নি। কারণ, তার মনে তখনও ঝড়-তুফান চলছে। হয়তো-বা পুলিশের ভয়ও উভয়কে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলছে। কারণ, বোলপুর কোর্ট থেকে যে কাগজ তারা করেছিল, সেটি বেলির ব্যাগে নেই।

তাছাড়া বেলির মন সর্বদা উর্ধ্বগামী। মুকুলের খালাতো ভাই বুলবুল সবেমাত্র চাকরি পেয়েছে ব্যাংকে। মোটা টাকা বেতন। দেখতে সুশ্রী, বড় হ্যান্‌সাম, অবিবাহিত ও স্মার্ট। তাকে দেখলে বেলির চোখ জুড়িয়ে যায়। বেলির হাবভাব দেখে বুলবুলও খুব মুগ্ধ। যে সময় মুকুল বাড়িতে থাকে না, সেই সময় বেশ মন-প্রাণ খুলে উভয়ে কথা বলে। আর সে

বাড়িতে থাকলেও যে তারা তাকে ভয় করে, তা নয়।

বুলবুলের বাড়িটাও বেশ সুন্দর। তার শোবার রুমটাও মনোরম। কিন্তু বড় আগোছালো ছিল। বেলি সেটিকে মনের মতো ক'রে সাজিয়ে দিলে বুলবুল বড় খোশ হয়। ভাবীর সাথে ভাল ভাব জমে তার। বড় মজার ভাবী। আকৃষ্ট হয় বেলি বুলবুলের প্রতি। তার অবস্থা বলে,

'আঁখি মেলে যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না সে সংশয়
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।'

বুলবুল জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের বাড়িতে কেমন লাগছে ভাবী?'

---খুব ভাল। শহরের নামটাও বেশ পছন্দ, লাভপুর, প্রেমনগর ইত্যাদি নামগুলো আমাকে খুব ভাল লাগে।

---ফুল ভাল লাগে, প্রেমের গান শুনতে, কবিতা পড়তে ভাল লাগে তাই না?

---তুমি কেমন ক'রে জানলে?

---যারা প্রেম করে, তাদের অভ্যাসই এমন।

---তুমি বুঝি কারো প্রেমে-টেমে পড়নি?

---তোমার মত ফুল না হলে কি আর বুলবুল কারো প্রেমে পড়ে? আমাকেও দেখছি 'লেডিজ স্পেশালিষ্ট' কাপড়ের দোকান খুলতে হবে, তাহলে তোমার মতো কাউকে চয়েস করা যাবে।

---তুমি বেশি প্রশংসা করছ।

---মোটেই না।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। বেলির জন্য সর্বোত্তম দিন লাভপুরের

দিনগুলি। বিশেষ ক'রে বুলবুলের ব্যবহার এবং সম্ভবতঃ তার ভালবাসার কারণেও। মুকুলও বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরার সময় লক্ষ্য করল, বেলি বুলবুলের বেডরুমে থাকে। একদিন রাতে সেই নিয়ে বেলি-মুকুলে বেশ তর্কাতর্কি হল। যতই লম্পট হোক, সে কখনও চায় না যে, তার প্রেমিকা অন্য কারও নিকট সময় কাটাক। মানুষের ঈর্ষাবোধ বলে একটা জিনিস আছে।

মুকুল বেলিকে বুলবুলের সাথে মাতামাতি করতে কড়াভাবে নিষেধ ক'রে দিল। কিন্তু সে কী ক'রে তা বন্ধ করবে? পানিতে বাস ক'রে কুমিরের সাথে বাদ করবে কেন?

মুকুল আবার পরের রাতে বেলিকে সাবধান করল। বেলি বলল, 'আমাকে সন্দেহ হলে, এখান থেকে অন্য জায়গায় চল।'

মুকুল বলল, 'যেখানেই যাব, তোমার স্বভাব তোমার সাথে যাবে। পুলিশের ভয় না থাকলে বাড়ি ফিরে যেতাম।'

---আমার স্বভাব বুঝি মন্দ, তাই না? তা যদি হয়, তাহলে তুমি আমাকে আনলে কেন? আমি পুলিশকে গিয়ে খবর ক'রে দেব।

মুকুল হাত তুলে আর গালে বসাতে পারল না। কোন ভয় তাকে বাধা দিল। বেলি তার প্রতি একেবারে চটে গেল। রাতেই তার রুম ছেড়ে পালাতে চাচ্ছিল।

তাদের চেঁচামেচি বাড়ির লোকেও শুনতে পেল। বুলবুলও বুঝল, মুকুল তারও চরিত্রে সন্দেহ করছে। সুতরাং সে সকালে মুকুলকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করল।

কিন্তু গেলে যাবে কোথায়? বোলপুর গেলে পুলিশে ধরবে। তারপর বেলিও সঙ্গে যেতে রাজি নয়। সে এখানেই থাকতে চায় অথবা নিজ বাড়ি ফিরে যেতে চায়।

বিকালে বুলবুল ব্যাংক থেকে ফিরে এসে দেখল, তারা এখনও যায়নি। মুকুল বাজারে গেছে। বেলি সুযোগ নিয়ে তাকে অনেক কথা বলল। তার বেলি-ফুলের বাগানের বুলবুল হতেও অনুরোধ করল। কিন্তু বুলবুল বলল, 'তাহলে আমাদের আত্মীয়তা শত্রুতায় পরিণত হয়ে যাবে। তাছাড়া তুমি হয়তো এখন ছেলের মা হতে চলেছ। তোমাকে বিয়ে করা কি আমার ঠিক হবে? তুমি বরং ওর সাথে যেতে না চাইলে বাড়ি চলে যাও। হয়তো দেখবে, বকুল ফুলের বাগান বেলি ফুলের বিরহে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

---তাকে আর মুখ দেখাতে পারব না। দু-দু'বার তাকে ছেড়ে মুকুলের কাছে এসেছি। আবার সে কি আমাকে গ্রহণ করবে?

---তাহলে তুমি মুকুলের সাথেই চলে যাও।

রাতে কেউ কারো সাথে কথা বলেনি। সকালে উঠে মুকুল-বেলি বিদায় নিল সকলের নিকট থেকে।

বর্ধমান স্টেশনে টিকিট কেটে অপেক্ষা করছিল দিল্লীগামী ট্রেনের। এমন সময় সামনে পুলিশ আসতে দেখে মুকুল অপ্রস্তুত অবস্থায় ছুটে লুকাতে গেল। সন্দেহে পড়ে পুলিশ তার পিছনে ধাওয়া করল। বেলি অজানার মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পরেও যখন মুকুল ফিরে এল না। তখন সে সিদ্ধান্ত নিল বাড়ি ফিরে যাবে। বকুল যদি উদার মনে ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার নিকট একেবারের জন্য ফিরে যাবে। নচেৎ সবশেষে বিষই হবে তার শ্রেষ্ঠ পানীয়।

ইতিমধ্যে মেঘ না চাইতেই পানি চলে এল। বকুল নিরাশ মনে

আবার সেই আশায় কলকাতায় হুজুরদের বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। অপেক্ষমাণ ট্রেনের জানালা থেকে বেলিকে দেখতে পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নেমে ছুটে এসে তার কাছে উপস্থিত হল। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘বেলি তুমি কোথায় ছিলে?’

---গুন্ডার সাথে। পুলিশ দেখে পালিয়েছে গুন্ডাটা।

---চলো, আমরাও পালিয়ে যাই।

---তাই চলো।

বেলি এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বকুলের সাথে মেন লাইন হাওড়া লোকালে উঠে বসল। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সাদা দু’টি ফুল, বেলি ও বকুল।

সমাপ্ত